বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরামর্শ পর্ষদ
কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী
ড. মুঃ সোহরাব আলী
মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার
ফরিদ আহমেদ
রাজিনারা বেগম

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মোঃ মহিউদ্দিন মানিক
মোছাঃ পাপিয়া সুলতানা
মোঃ মুজাহিদুর রহমান
মোঃ হারুন অর রশীদ
ফারহানা মুস্তারী

আলোকচিত্র
সমর কৃষ্ণ দাস

কম্পিউটার কম্পোজ
মিন্টু চন্দ্র দাস

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত
প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৭

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। এরই আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অন্যদিকে পরিবেশ সুরক্ষা দুটি দিক বিবেচনায় রেখেই বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রমকে আরো অধিক গতিশীল করেছে। আশি আশা করি ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে আমরা সেই গতিশীলতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবো।

প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার অভিনন্দন।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

উপমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার একটি অন্যতম মাধ্যম। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অন্যতম। রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে কোন ভাবেই দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সে জন্য সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে সমান গুরুত্ব প্রদান করে পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্তপূর্বক বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। অধিকন্তু সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ আইন, বিধিমালা, পলিসি ও গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করছে। সরকারের পরিবেশ বিষয়ক আইন, বিধিমালা ও পলিসি বাস্তবায়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ এবং জীবন ও জীবিকার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে নদী। শিল্পের তরল বর্জ্য যাতে নদ-নদীর পানিকে দূষিত করতে না পারে সে জন্য তরল বর্জ্য নির্গমনকারী সকল শিল্পে ইটিপি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকার শিল্পের বর্জ্য পানি পরিশোধনপূর্বক পুনরায় উক্ত শিল্পে যাতে ব্যবহার করা যায় সে লক্ষ্যে জিরো ডিস্চার্জ পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হাজারীবাগের চামড়া শিল্পের তরল বর্জ্য হতে বুড়িগঙ্গা নদীকে রক্ষার জন্য শিল্প কারখানাসমূহকে বন্ধপূর্বক কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক সাভারের হরিণধরায় স্থানান্তর করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের সকল উদ্যোগ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ তে পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের এ সকল কার্যক্রমের তথ্য ভিত্তিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে যা হতে পাঠকগণ দেশে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব)

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার। মাথাপিছু গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের হার উন্নত দেশের তুলনায় অতি নগণ্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সরকার অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরে ক্ষতিপূরণ আদায়েও কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সকল কার্যক্রমে সরকারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান এবং দেশের বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, ভূমির অবক্ষয় রোধ, শব্দদূষণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে পরিবেশ অধিদপ্তরেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরও সমন্বয়ে কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭- এ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা প্রতিফলিত হবে এবং প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্টদের দাপ্তরিক ও গবেষণামূলক কাজে সহায়ক হবে।

আমি আশা করি, পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আমি পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি এবং প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ইসতিয়াক আহমেদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

বাণী

দেশের সার্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও তার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ হতে পাঠকগণ পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও গ্রিন টেকনোলজির বিকাশ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার এবং জীবসম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন- ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি- ২০১৭ অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে Ecologically Critical Area (ECA) সমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোমধ্যে ECA Rules 2016 জারি করা হয়েছে।

পরিবেশ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও সংরক্ষণের স্বার্থে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি, দেশের আপামর নাগরিক সমাজের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম ও সচেতনতাবোধ জাগ্রত করতে হবে। এ বিষয়ে সচেতন নাগরিকসমাজ, পরিবেশবাদী সংগঠন, এনজিও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পোদ্যোক্তা এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সমন্বিত উদ্যোগ ও সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৬-২০১৭ সংশ্লিষ্টদের পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করবে ফলে দেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ -২০১৭ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন তথ্য উপাত্ত দিয়ে যাঁরা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন এবং এই প্রতিবেদন প্রকাশনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আসুন, আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য স্ব স্ব অবস্থান থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই।

(মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল)

بسم الله الرحمن الرحيم

উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

সুস্থ পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান পানি। সুস্থ ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে পানির গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই মানুষ তার পরিশ্রান্ত জীবনে প্রশান্তি পেতে ছুটে যায় সাগর, নদী ও ঝর্নার কাছে। মানুষ যখন সুন্দর পরিবেশ গড়তে চায় তখন সে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সঙ্গে ঝর্না, ফোয়ারা কিংবা লেক তৈরি করে। তাইতো আমরা দেখি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআনে যেখানে বেহেস্তের বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেই প্রবহমান ঝর্নার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে অফুরন্ত পানি থাকায় এখানকার মানুষ পানিকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি। পানিকে সবচেয়ে গুরুত্বহীনভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাই দেখা যায় কোন কিছুকে স্বল্প মূল্য বা মূল্যহীন তুলনা করতে "পানির দর" কথাটি ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে দুধকে প্রাচুর্যের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সন্তানকে দোয়া করার সময় বলে "তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। বাংলাদেশে পানির দরের উপমা এখন আর প্রযোজ্য নয়। মানুষ এখন দুধের দামে পানি খায়।

বাংলাদেশের অমূল্য পানি সম্পদ আজ নানা প্রকার পরিবেশ দূষণে জর্জরিত। এ সকল পরিবেশ দূষণের মধ্যে অন্যতম হলো–শিল্প-বর্জ্য, শহরের পয়ঃবর্জ্য, নৌযানের অপরিশোধিত তেল এবং কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্প-বর্জ্যসহ সকল প্রকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প-বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের পাশাপাশি শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবেশ অধিদপ্তর তরল বর্জ্য নির্গমনকারী প্রতিটি শিল্প কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন বাধ্যতামূলক করেছে। ইটিপি স্থাপন ব্যতীত শিল্প-কারখানা পরিচালনার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কিংবা নবায়ন করা হয় না। শুধু ইটিপি স্থাপন দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত নয়, প্রয়োজন সার্বক্ষণিক কার্যকরভাবে পরিচালনা। এ জন্য প্রয়োজন শিল্প-মালিকসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা, সদিচ্ছা ও সচেতনতা।

পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্প-মালিকসহ নাগরিক সমাজের মধ্যে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। শিল্প-বর্জ্যসহ পানি দূষণের অন্যান্য উৎস বন্ধের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা, শিল্প মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ করছে। প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭-এ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত এ সকল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদনে পানি দূষণসহ অন্যান্য দূষণের বর্তমান অবস্থার তথ্যাদিও তুলে ধরা হয়েছে যা থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরিবেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে যা সংশ্লিষ্টদের কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিবেদনটি প্রকাশে তথ্য দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল শাখা ও দপ্তর সহায়তা করেছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপ-মন্ত্রী, সম্মানিত সচিব এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বার্ষিক প্রতিবেদনের তাৎপর্য তুলে ধরে মূল্যবান বাণী প্রদান করে প্রতিবেদনকে আরো অধিক সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পরামর্শ পর্ষদ ও সম্পাদনা পরিষদের সকল কর্মকর্তাকে যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

পরিবেশ বান্ধব শিল্প গড়ি
জীববৈচিত্র্য রক্ষা করি

টেক্সটাইল শিল্পের ইটিপির অংশবিশেষ

সূচিপত্র

মাননীয় মন্ত্রীর বাণী	(iii)
মাননীয় উপমন্ত্রীর বাণী	(iv)
সচিব মহোদয়ের বাণী	(v)
মহাপরিচালক মহোদয়ের বাণী	(vi)
সম্পাদকীয়	(vii)
প্রথম অধ্যায়	
পরিবেশ অধিদপ্তরের পটভূমি	১২
পরিবেশ অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন	১৩
পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলী	১৩
পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল	১৪
পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম	১৮
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ	১৮
জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ	১৯
জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম	২০
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	২১
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর ওপর এর প্রভাব নিরূপণ	২২
তৃতীয় অধ্যায়	
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	২৬
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি	২৬
জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	২৬
শব্দমাত্রা জরিপের ফলাফল	২৯
চতুর্থ অধ্যায়	
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম	৩৪
এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি	৩৪
পরিবেশ বিষয়ক মামলা ও রিট	৩৭
রাজস্ব কার্যক্রম	৩৭
হাজারীবাগ ট্যানারী কারখানা বন্ধকরণ কার্যক্রম	৩৮
পঞ্চম অধ্যায়	
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম	৪২
ইটভাটার আধুনিকীকরণ	৪৩
যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	৪৪
বায়ুদূষণ রোধকল্পে অন্যান্য প্রকল্পসমূহ	৫১
পরিবেশ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন রিও প্রকল্প	৫১
ষষ্ঠ অধ্যায়	
পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	৫৪
পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ	৫৪
মেঘনা নদী হতে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ	৫৯

সুনামগঞ্জ জেলার আগাম বন্যাকবলিত টাঙ্গুয়ার হাওর ও মাটিয়ান হাওর এলাকায় পানিদূষণ মনিটরিং	৬০
সপ্তম অধ্যায়	
শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান	৬৪
পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য	৬৫
বিভাগওয়ারি স্থাপিত ইটিপি ও ইটিপিবিহীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তথ্য:	৬৬
জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা	৬৬
শিল্প-প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা	৬৭
শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ছাড়পত্র নবায়ন ফি	৬৭
অষ্টম অধ্যায়	
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম	৭০
বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ প্রণয়ন	৭০
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন	৭০
ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (NBSAP) ২০১৬-২০২১	৭০
প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area সংক্ষেপে ECA/ইসিএ)	৭০
ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৭২
ভূমির অবক্ষয় ও মরুময়তা প্রতিরোধ কার্যক্রম	৭৩
নবম অধ্যায়	
মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	৭৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন	৮১
ছাড়পত্র অটোমেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি	৮২
দশম অধ্যায়	
পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম	৮৪
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন	৮৪
পরিবেশ মেলা আয়োজন	৮৫
জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান	৮৫
৬ষ্ঠ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক ২০১৭	৮৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন	৮৭
বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন	৮৭
টেলিভিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ প্রচার	৮৭
অভিযোগ প্রতিকার ও গণশুনানি	৮৮
একাদশ অধ্যায়	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়ন	৯০
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R (Reduce, Reuse and Recycle) প্রকল্প বাস্তবায়ন	৯২
নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বন্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম	৯৩
ওজোন স্তর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	৯৫
প্রকল্পটির আওতায় মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ	৯৬
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ	৯৭

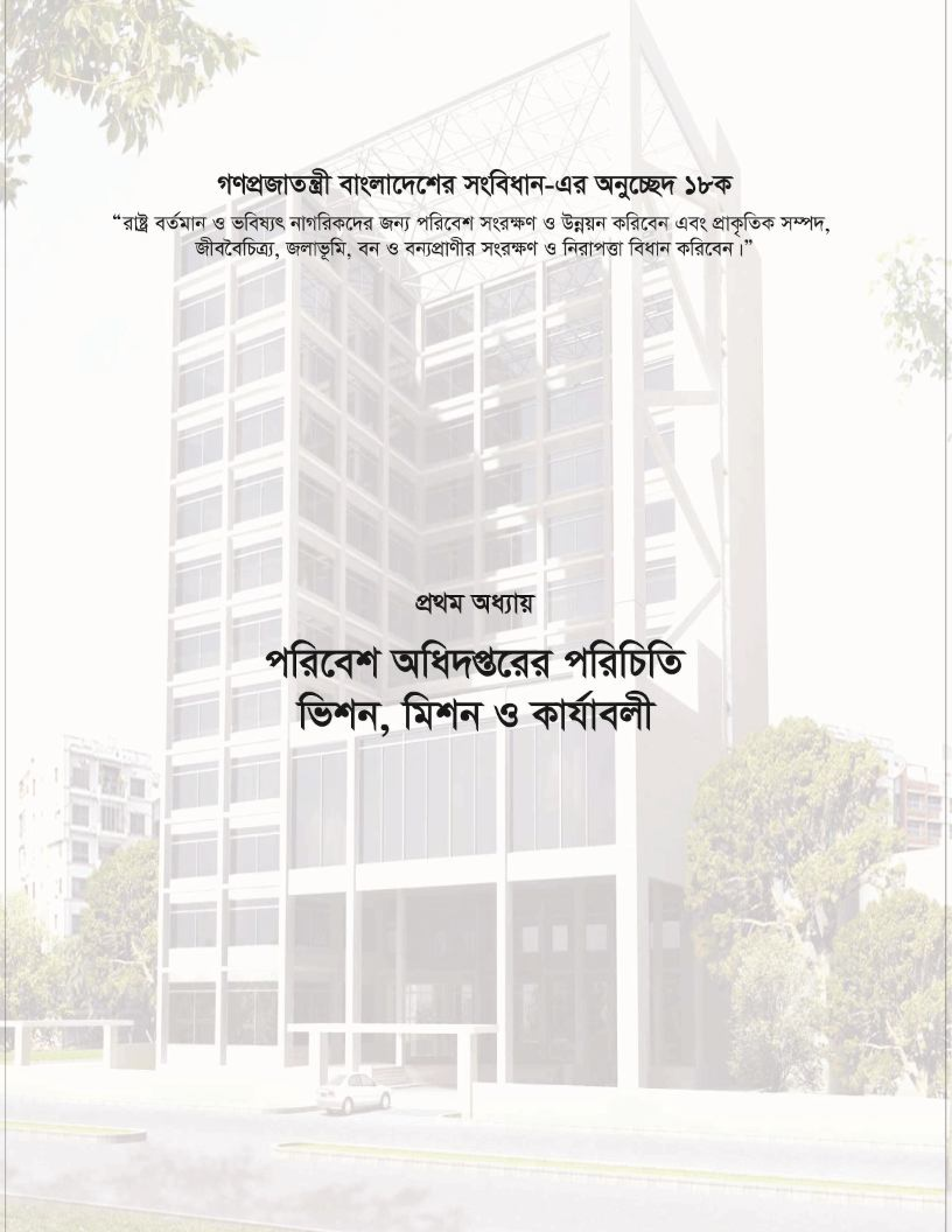

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর অনুচ্ছেদ ১৮ক

"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচিতি ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী

ভূমিকা

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয় United Nations Conference on the Human Environment। সম্মেলনে শিল্পায়নের কারণে যে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিরসনের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমের যাত্রা শুরু এবং United Nations Environment Program (UNEP) এর সৃষ্টি। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Water Pollution Control Ordinance জারি করেন। ১৯৭৩ সালেই পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারি করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ২০০১ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনবল ছিল মাত্র ১৯১ জন। পরবর্তীকালে সরকার ২০১০ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ২১টি জেলায় সম্প্রসারণ করে এবং জনবল ৭৩৫ জনে উন্নীত করে।

বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে অত্যন্ত আন্তরিক। তাই সরকার সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং জীববৈচিত্র্য জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা বিধান করবে। শুধু তাই নয়, সরকার তার চলতি মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সরকার বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। মূলত পরিবেশ অধিদপ্তর একটি পরিবেশ বিষয়ক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। কাজের ধরন অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলঃ বায়ু, পানি ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ভিশন:

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মিশন:

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে-

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা।
- পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ।
- পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- "গ্রিন গ্রোথকে" উৎসাহিত করা।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলী:

১. শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা।

২. পরিবেশ সংক্রান্ত আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা;

৪. নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্পকারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সন্তোষজনক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্র নবায়ন;

৫. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

৬. পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;

৭. বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;

৮. দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;

৯. পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১১. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ; ওজোন স্তর সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহায়তায় স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ, গণসচেতনতা ও অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

১২. ইট ভাটার দুষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩. পরিবেশ সংক্রান্ত গ্রিন/ক্লিন টেকনোলজি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগপূর্বক টেকনোলজি প্রচলনের জন্য পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেকনোলজি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

১৪. দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;

১৫. বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;

১৬. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রের থ্রী আর পদ্ধতি প্রচলনে উৎসাহিত করা;

১৮. পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন;

১৯. দেশের পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ;

২০. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/ সাংস্কৃতিক/ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;

২১. পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণাকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

২২. নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৩. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;

২৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন;

২৫. দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন;

২৬. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত জনবল ৭২০ জন (১৫টি কাজ নেই, মজুরী নেই ভিত্তিক সৃষ্ট পদ ব্যতীত), কর্মরত জনবল ৪৪৮ জন এবং শূন্যপদ ২৭২টি।

টেবিল ১ : পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল

ক্রমিক নং	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্য পদ
১।	১ম শ্রেণী	২০৫	১১৪	৯১
২।	দ্বিতীয় শ্রেণী	১২৫	৫৮	৬৭
৩।	তৃতীয় শ্রেণী	২৬৮	১৮৩	৮৫
৪।	৪র্থ শ্রেণী (আউট সোর্সিংসহ) (১৫টি কানামনা পদ ব্যতীত)	১২২	৯৩	২৯
৫।	মোট	৭২০	৪৪৮	২৭২

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

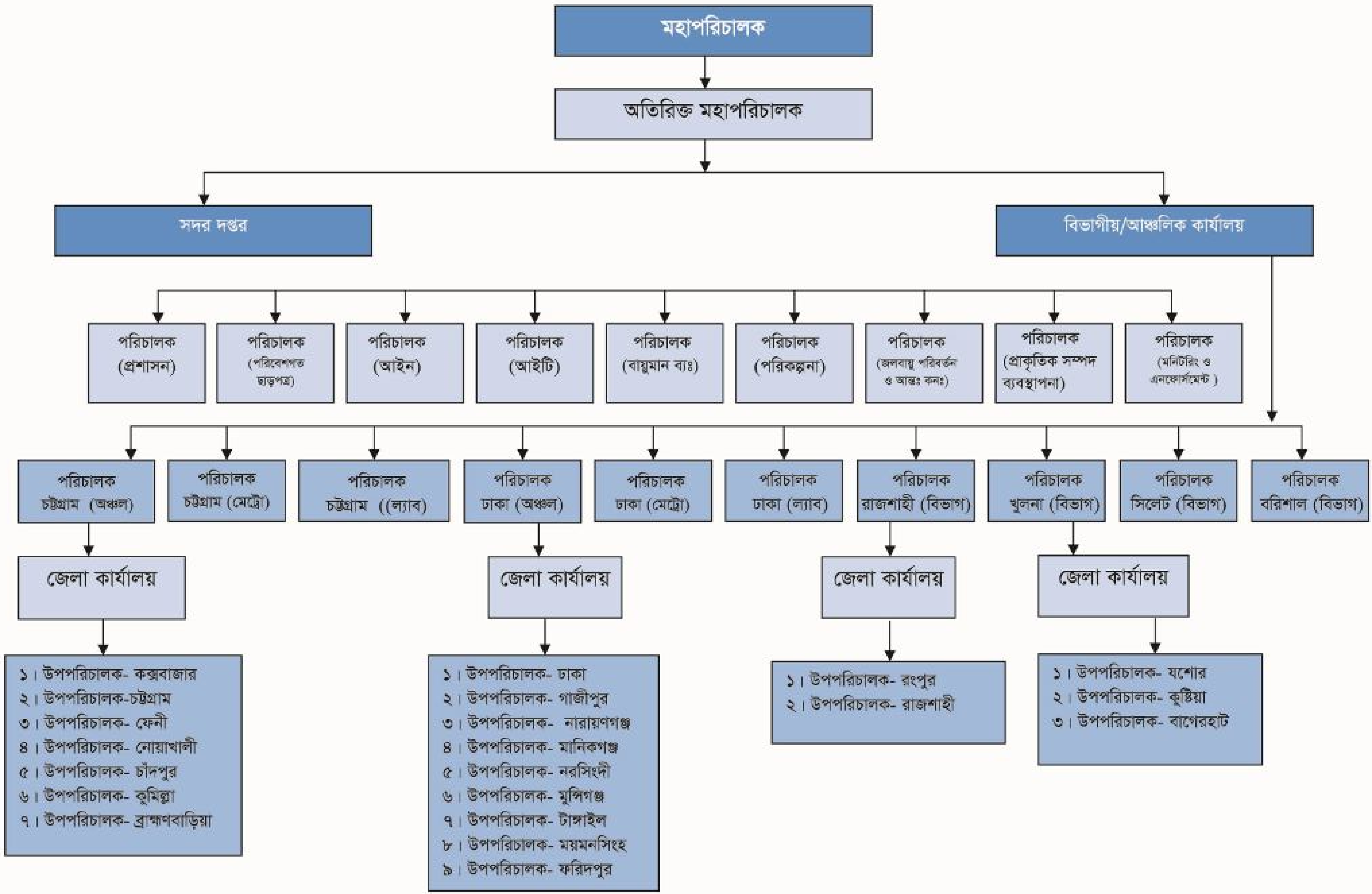

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক হাকালুকি ইসিএতে স্থাপিত সৌর বিদ্যুৎ চালিত ইরিগেশন পাম্প

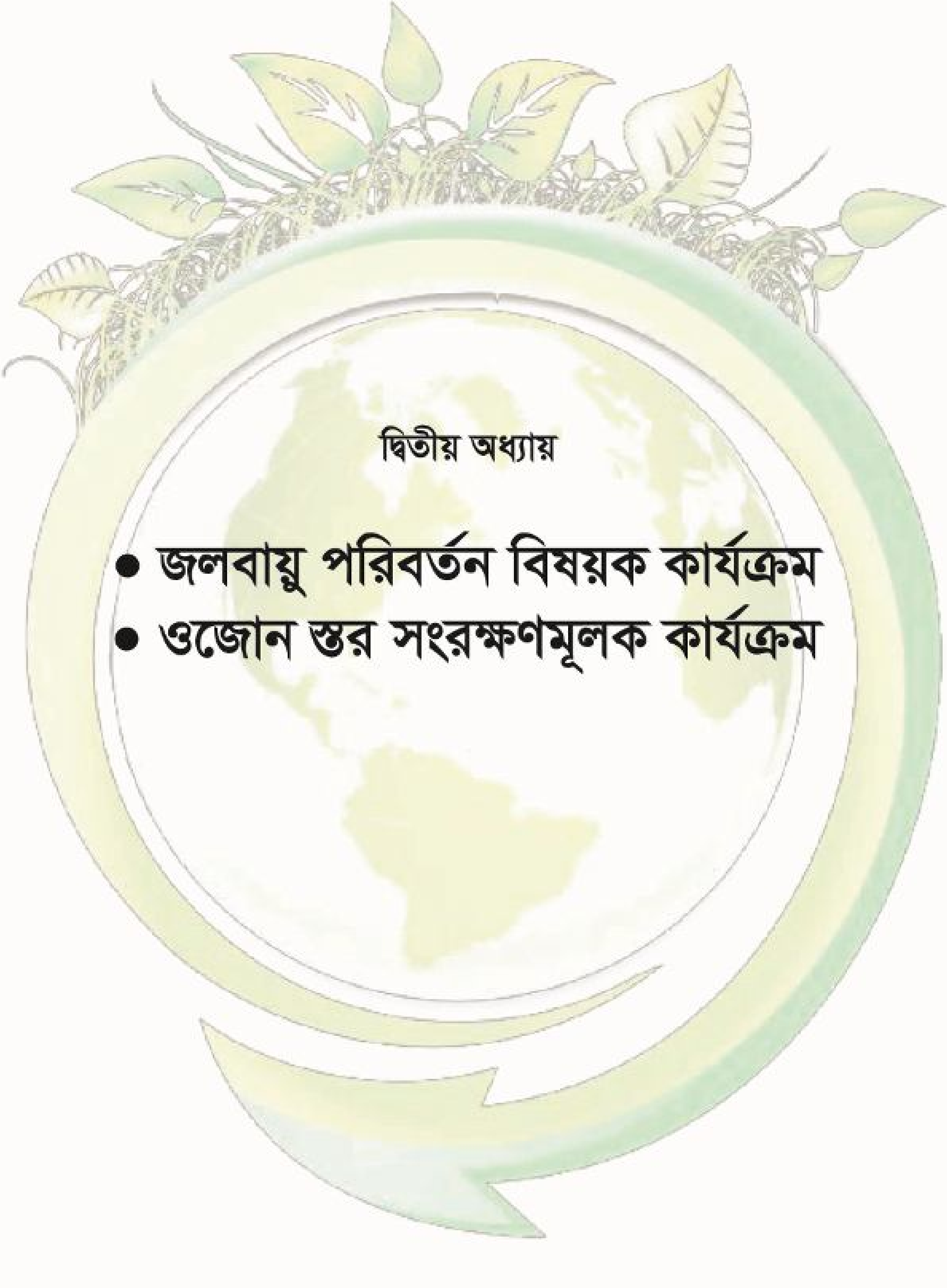

দ্বিতীয় অধ্যায়

• জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম
• ওজোন স্তর সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান অতি সামান্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। IPCC-র 5th Assessment Report-এর তথ্যানুযায়ী ১৯০১ থেকে ২০১০ সময়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বেড়েছে ১৭-২১ সেন্টিমিটার। যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে এবং বরফ গলছে তাতে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সরকার দেশের অভ্যন্তরে অভিযোজন ও প্রশমনমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত আন্তর্জাতিক সকল উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক সকল উদ্যোগে পরিবেশ অধিদপ্তর সরকারকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত দেশের অভ্যন্তরে বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় সত্যিকার অর্থে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, কার্যকর, দীর্ঘমেয়াদী, সকলের অংশগ্রহণমূলক, আইনি বাধ্যবাধকতাযুক্ত সার্বজনীন চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্যারিস চুক্তি একটি ঐতিহাসিক শুভ সূচনা। এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিঁড়ি বেয়েই ধাপে ধাপে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি হবে এবং বিশ্ব সম্প্রদায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বৈশ্বিক সমস্যাকে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব জনাব বান কি-মুনের আমন্ত্রণে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে একটি ঐতিহাসিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের ১৯৭টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ঘটনা। এ পর্যন্ত ১৯৫টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে এবং বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মোট ১৭২টি সদস্য দেশ অনুস্বাক্ষর বা রেটিফাই করেছে। আরও উল্লেখ্য যে, বিগত ০৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে।

চিত্র ১ : মরক্কোর মারাকাসে অনুষ্ঠিত ২২তম জলবায়ু সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে মারাকাস জলবায়ু সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। UNFCCC-র আওতায় বিগত ০৭ নভেম্বর হতে ১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মরক্কোর মারাকাস শহরে অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP22) যার মূল লক্ষ্য ছিল প্যারিস চুক্তিতে গৃহীত বিভিন্ন বিষয় বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী (modalities, procedures and guidelines) প্রণয়নের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা। মারাকাস জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স বডি Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ২ : মরক্কোর মারাকাসে অনুষ্ঠিত ২২তম জলবায়ু সম্মেলনে প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু , এমপি

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ুতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। উষ্ণতা আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতু বৈচিত্র্যের রূপকে করছে ক্ষুণ্ন। যার কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ তথা অতি বৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১৭ থেকে ২১ সেন্টিমিটার। সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমূহ ও বিপন্নতা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা এবং সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে জলবায়ুর নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে:

- বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা মে মাসে ১ ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেঃ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করেছে;
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত স্বল্প সময়ে বেশি বৃষ্টিপাত শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে;
- ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বিগত ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ এবং ২০০৭ সালে;
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রকোপতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অশান্ত সমুদ্র জেলেদের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

Global Climate Risk Index (GCRI) 2010-এর তথ্যানুসারে ১৯৯০ হতে ২০০৮ সাল সময়ে গড়ে প্রতিবছর ৮২৪১ জন লোক নিহত হয়েছে, বছরে ১.২ বিলিয়ন সমমূল্যের সম্পদ নষ্ট হয়েছে এবং ১.৮১ শতাংশ হারে জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 'জার্মান ওয়াচ' কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৮' অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকি সূচকে ৬ নম্বরে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক জুন ২০১৪-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায় যদি কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৯.৪ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম
Climate Technology Centre and Network (CTCN)

উন্নত দেশগুলো হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে UNFCCC-এর অধীনে Climate Technology Centre and Network (CTCN) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। CTCN-এর সাথে জাতীয় পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তি স্থানান্তরে সমন্বয় সাধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে National Designated Entity (NDE) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে NDE Focal Point হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। CTCN-এর আওতায় প্রাথমিকভাবে ০৫টি অভিযোজন ও প্রশমন টেকনোলজি চিহ্নিত করে Technical Assistance এর জন্য CTCN-এ প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। CTCN-এ জমাদানকৃত ০৫টি প্রকল্পের মধ্যে ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত ০৩টি প্রকল্পের আওতায় প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক) Technical assistance for saline water purification technology at household level and low-cost durable housing technology for coastal areas of Bangladesh (পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত)

খ) Development of a certification course for energy managers and energy auditors of Bangladesh (টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত)

গ) Technology for Monitoring & Assessment of Climate Change Impact on Geo- morphology (Sea level rise/fall, Salinity, Sedimentation etc) in the Coastal Areas of Bangladesh (বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত)

Joint Crediting Mechanism (JCM)

জাপান সরকার কর্তৃক গৃহীত Joint Crediting Mechanism (JCM)-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাপান হতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ/প্রচলনে সহায়তা লাভ করছে যার মূল লক্ষ্য স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা। JCM-এর আওতায় JCM Model Project বাস্তবায়নে জাপান সরকার কর্তৃক ৫০% পর্যন্ত অনুদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, JCM-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে ঢাকায় "Low Carbon Growth Partnership

between the Japanese side and the Bangladeshi side" বিষয়ে MoU স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে JCM সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। ২০১৬-২০১৭ সময়ে JCM সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(১) JCM প্রকল্প গ্রহণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI)-কে সাথে নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে ০১টি কর্মশালাসহ মোট ০২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;

(২) JCM বিষয়ক বাংলা ভাষায় একটি চার্ট বা সহায়ক পুস্তিকা এবং একটি লিফলেট প্রণয়ন করা হয়েছে;

(৩) প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম : জাপানের সহায়তায় বাংলাদেশে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০২টি জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে -

(ক) Energy saving by installation of High-efficiency Loom at Weaving Factory of Hamid Fabrics Limited, Bangladesh.

(খ) Installation of High Efficiency Centrifugal Chiller for Air Conditioning System in Clothing Tag Factory of NEXT Accessories Ltd, Rupganj, Narayanganj.

(৪) JCM-এর আওতায় ময়মনসিংহের সুতিয়াখালিতে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ আরও ০৩টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" শীর্ষক একটি গবেষণা বাংলাদেশের তিনটি স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), Institute of Water and Flood Management (IWFM) of BUET এবং Institute of Water Modelling (IWM) এর কারিগরি সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের টাইডাল গেজ (Tidal Gauge) স্টেশনের বিগত ৩০ বছরের উপাত্ত (Data) নিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রবণতা বিশ্লেষণ (Trend Analysis) করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নিম্ন গাঙ্গেয় পললভূমি, মেঘনা মোহনা পললভূমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি বছর ৬-২১ মিলিমিটার। এই প্রথম দেশীয় তিনটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিবেদনটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে বাংলাদেশের ঝুঁকি নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের পক্ষে একটি দালিলিক প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) প্রণয়ন

Global Environment Facility (GEF)-এর অর্থায়নে UNDP Bangladesh-এর সহায়তায় "বাংলাদেশঃ থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) টু দি ইউএনএফসিসিসি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের voluntary obligation হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাসংগিক তথ্যাদি সমৃদ্ধ থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা পরবর্তীতে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ পেশ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে Green House Gas Inventory প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ ইনভেন্টরিতে Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) -এর গাইডলাইন অনুযায়ী নিম্নোক্ত পাঁচটি সেক্টর/খাতে ২০০৬-২০১২ সময়ে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নির্ণয় করা হচ্ছে -

(১) Energy

(২) Industrial Processes and Product Use (IPPU)

(৩) Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)
(৪) Waste
(৫) Other (e.g., indirect emissions from nitrogen deposition from non-agriculture sources)

এছাড়াও এ প্রকল্প হতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, মূল প্রতিবেদন "Bangladesh: Third National Communication (TNC) to the UNFCCC"-এর খসড়া ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণপূর্বক ২০১৮-এর মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে UNFCCC-এ পেশ করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ

জার্মান দাতা সংস্থা GIZ-এর সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে দেশব্যাপী (৬৪ টি জেলায়) এবং সেক্টরভিত্তিক vulnerability assessment করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় পর্যায়ে তিনটি এবং উপকূলীয় অঞ্চল, বন্যা ও খরা প্রবণ এলাকায় Hot Sopt Based দুইটি vulnerability assessment প্রণয়ন করা হবে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় GIZ-এর সহায়তায় ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনগণের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে একটি Climate Change Impact Chain বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন চলমান রয়েছে।। এছাড়াও, সামগ্রিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি GIS ল্যাবরেটরীও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ১০জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ৩ : জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় আয়োজিত Climate Change Impact Chain বিষয়ক কর্মশালায় সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর ওপর এর প্রভাব নিরূপণ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট-এর অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণপূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর ওপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" বা "বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর ওপর এর প্রভাব নিরূপণ" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

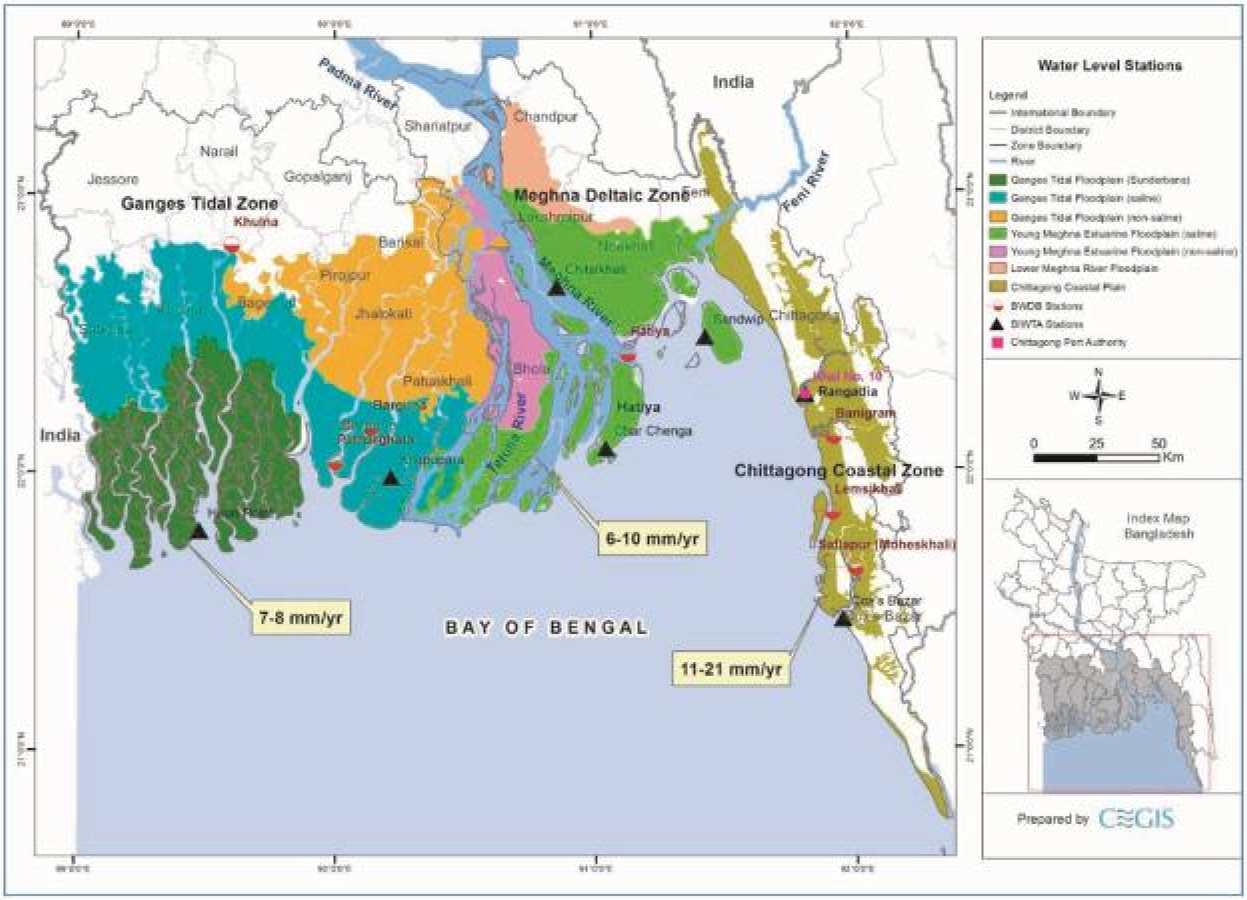

মানচিত্র ১ : বিগত ত্রিশ বছরে নিম্ন গাঙ্গেয় পললভূমি, মেঘনা মোহনা পললভূমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার
উৎস: পরিবেশ অধিপ্তর, ২০১৬

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

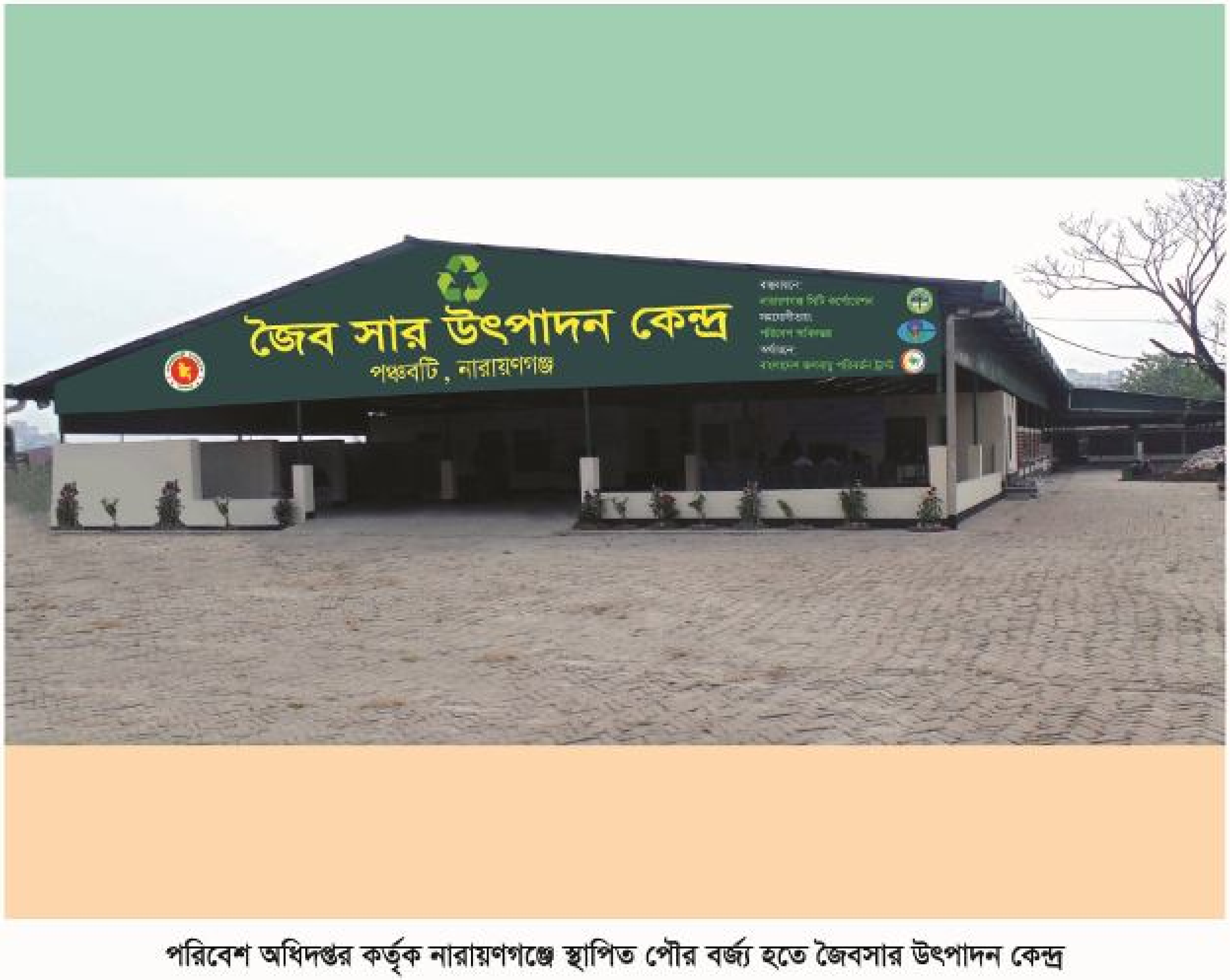

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত পৌর বর্জ্য হতে জৈবসার উৎপাদন কেন্দ্র

তৃতীয় অধ্যায়

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি

শব্দ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু এ শব্দ যখন মাত্রা অতিক্রম করে, তখন দূষণ সৃষ্টি হয়। নগরায়ন, শিল্পায়ন, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, যানবাহন, যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কারণে দূষণ সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণ মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ঢাকা শহরের বহুমাত্রিক পরিবেশ সমস্যার অন্যতম হচ্ছে শব্দদূষণ। দেশের বড় বড় নগরীগুলো শব্দদূষণের মারাত্মক শিকার। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীর শব্দদূষণ সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। শব্দদূষণের কারণে মাথা ধরা, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, মনোসংযোগ নষ্ট ও অনিদ্রাসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। শব্দদূষণ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে শিশু ও বয়স্কদের। বিশেষ করে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি (বাস্তবায়নকাল-২০১৫-২০১৭) এর মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্নমুখী প্রায়োগিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচিটির আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

টিভি স্পট প্রচার: গাড়িচালক,সাইরেন ব্যবহারকারী গাড়িচালক, শিক্ষার্থী, গাড়ি মালিক, সাধারণ জনগণকে উদ্দেশ্য করে নির্মিত ৫টি টিভি স্পট দুটি ধাপে মোট ১৩টি টিভি চ্যানেলে সর্বমোট প্রায় ১০০০ মিনিট প্রচার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহ বিভাগে অনুষ্ঠিত শিক্ষার্থী, চালক ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণেও টিভিসিগুলি প্রদর্শন করা হয়।

শব্দসচেতনতামূলক টিভি অনুষ্ঠান:

চ্যানেল আই-তে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২৫ মিনিটে শব্দসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। প্রতিটি পর্ব চারটি ভাগে বিভক্ত: শব্দসচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ মতামত, চলুন জেনে নিই এবং সবশেষে কুইজ।
বিশেষজ্ঞ মতামতসহ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব আলী ইমাম। অনুষ্ঠানটির প্রতিটি পর্বে ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রামাণ্যচিত্র, নাটিকা, তথ্যনাট্য, লোকগান, জারিগান, গম্ভীরা, মূকাভিনয় ইত্যাদি। পরিবেশ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হয়েছে।

চিত্র ৪ : শব্দ সচেতনতামূলক টিভি অনুষ্ঠানের সর্বশেষ পর্ব

স্বপ্রণোদিত শব্দসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার:

বাংলাদেশ বেতারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ: পরিবেশ সুরক্ষা অনুষ্ঠানে শব্দদূষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ।দীপ্ত টেলিভিশনের খোলা জানালা, বৈশাখী টেলিভিশন এবং চ্যানেল আই-এর প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে শব্দদূষণের ওপর বিশেষ পর্ব প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচির কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে শব্দসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস উদযাপন: ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের সম্মুখস্থ ন্যাম ভবনের সম্মুখে শব্দসচেতনতা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৫ : আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে সমাবেশ

আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে চ্যানেল আই-এ গানে গানে সকাল শুরুর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং একই চ্যানেলে শব্দ সচেতনতায় বিশেষ তৃতীয় মাত্রা প্রচারিত হয়। তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রইছউল আলম মন্ডল, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা)-এর চেয়ারম্যান জনাব আবু নাসের খান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম বদরুজ্জামান এবং সঞ্চালনা করেন মোঃ জিল্লুর রহমান।

সচেতনতামূলক উপকরণ:

বিভাগীয় শহরে প্রশিক্ষণ ও ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামে লিফলেট ও স্টীকার বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা মুদ্রণ করা হয়। কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে একটি ফ্লায়ার প্রকাশ ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পরিবেশ মেলায় অধিদপ্তরেরের স্টল থেকে বিতরণ করা হয়।

এছাড়া আটটি বিভাগীয় শহরের জরিপের ফলাফল নিয়ে একটি ফ্যাক্ট শিট মুদ্রণ এবং সমাপনী সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ প্রচার: গণমাধ্যম গুরুত্বের সাথে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করে।

অনলাইন পোর্টাল ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার: শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য প্রচার করা হয়। কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষে স্থির ও ভিডিও চিত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

নীরব এলাকা চিহ্নিত সাইনপোস্ট স্থাপন:

ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪০ টি স্থানে নীরব এলাকা চিহ্নিত সাইনপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবসে এ মানিক মিয়া এভিনিউ ও মিরপুর সড়কের সংযোগস্থলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি সাইনপোস্ট উদ্বোধন করেন।

চিত্র ৬ : নীরব এলাকা চিহ্নিত সাইন পোস্টের উদ্বোধন

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম:

চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী, চালকদের প্রশিক্ষক, চালক ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সাউন্ড লেভেল মিটার সংগ্রহ ও বিতরণ:

২০০ সাউন্ড লেভেল মিটার, ১০টি একুস্টিক ক্যালিব্রেটর, ৩০টি ট্রাইপড পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ এবং পুলিশের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ সকাল ১১:০০ টায় পরিবেশ অধিদপ্তরের চামেলি সভাকক্ষে সাউন্ড লেভেল মিটার বিতরণ অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি প্রধান অতিথি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রইছউল আলম মণ্ডল।

চিত্র ৭ : সাউন্ড লেভেল মিটার বিতরণ

জরিপ কার্যক্রম:

চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে শব্দের মাত্রা পরিমাপে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপের আওতায় শব্দের মাত্রা পর্যবেক্ষণ (ছুটির দিন/কর্মদিবস/পিক আওয়ার/অফ পিক আওয়ার-এ), শব্দের উৎস পর্যবেক্ষণ, হর্ন গণনা, জনমত যাচাই এবং বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয়।

টেবিল ২ : বিভাগীয় শহরের শীর্ষ এবং নিম্ন শব্দমাত্রা:

বিভাগীয় শহর	সাতটি শহরের প্রথম ও শেষে অবস্থানকারী স্থানের রেকর্ডকৃত আকস্মিক (Impulse)শব্দের মাত্রা (dBA)					
	স্থান	সর্বোচ্চ (dBA)	সর্বনিম্ন (dBA)	স্থান	সর্বোচ্চ (dBA)	সর্বনিম্ন (dBA)
ঢাকা	পল্টন মোড়	১৩২	৬০.৪	ব্লক-সি, সেকশন-১, মিরপুর	৯৯.১	৫১
চট্টগ্রাম	বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল	১৩৩.৪	৫৫.৪	পোর্ট কলোনী	৯৯.৩	৪৭.২
সিলেট	করিমউল্লাহ মার্কেট	১৩০.৬	৫১.৫	কোর্ট পয়েন্ট	৮১.৮	৫০.১
খুলনা	ডাকবাংলো মোড়	১৩১.৬	৪৭.৭	সরকারি মহিলা কলেজ মোড়	১০৩.৭	৪১.৯
বরিশাল	কাশিপুর বাজার	১৩১.৩	৬৫.৬	ভাটিখানা	১২২.২	৫৪.৩
রংপুর	রংপুর বাস টার্মিনাল	১৩০.১	৬৩	কামাল কাছনা, গুঞ্জন মোড়	৮৭.৩	৪৫.৫
রাজশাহী	ভদ্রার মোড়	১৩২.৮	৬১.৯	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	৮৮.১	৫৬.৩
ময়মনসিংহ	ধোপাখোলা মোড়	১৩০.৭	৫০.৯	বাকৃবি আবাসিক এলাকা	৮৭.৭	৪৭.৪

সাতটি শহরের জরিপের জন্য নির্বাচিত প্রতিটি স্থানের রেকর্ডকৃত আকস্মিক (Impulse)শব্দের মাত্রা (dBA) চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

দেশের আটটি মহানগরের শব্দমাত্রা জরিপের ফলাফল:

ক. ঢাকা বিভাগীয় শহর: ঢাকা শহরে জরিপকৃত স্থানসমূহের নিম্নে শব্দের মাত্রা (dBA) ভেদে স্থানগুলিকে সাজানোর পাশাপাশি লাল রং দ্বারা সর্বোচ্চ এবং নীল রং দ্বারা সর্বনিম্ন আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা (dBA) বোঝানো হয়েছে।

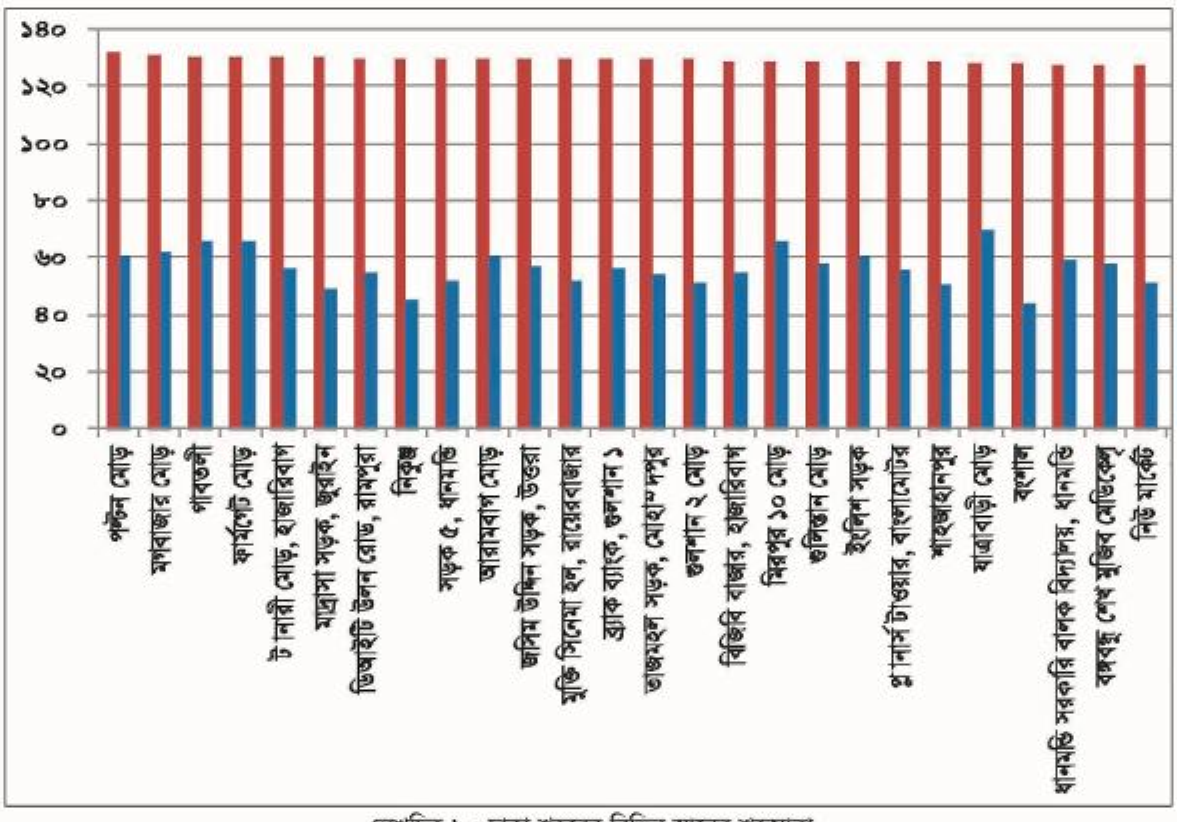

লেখচিত্র ১ : ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

খ. চট্টগ্রাম মহানগর: চট্টগ্রাম শহরে মোট ৪১টি স্থানে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে শব্দের মাত্রা (dBA) ভেদে স্থানগুলিকে সাজানোর পাশাপাশি লাল রং দ্বারা সর্বোচ্চ এবং নীল রং দ্বারা সর্বনিম্ন আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা (dBA) বোঝানো হয়েছে।

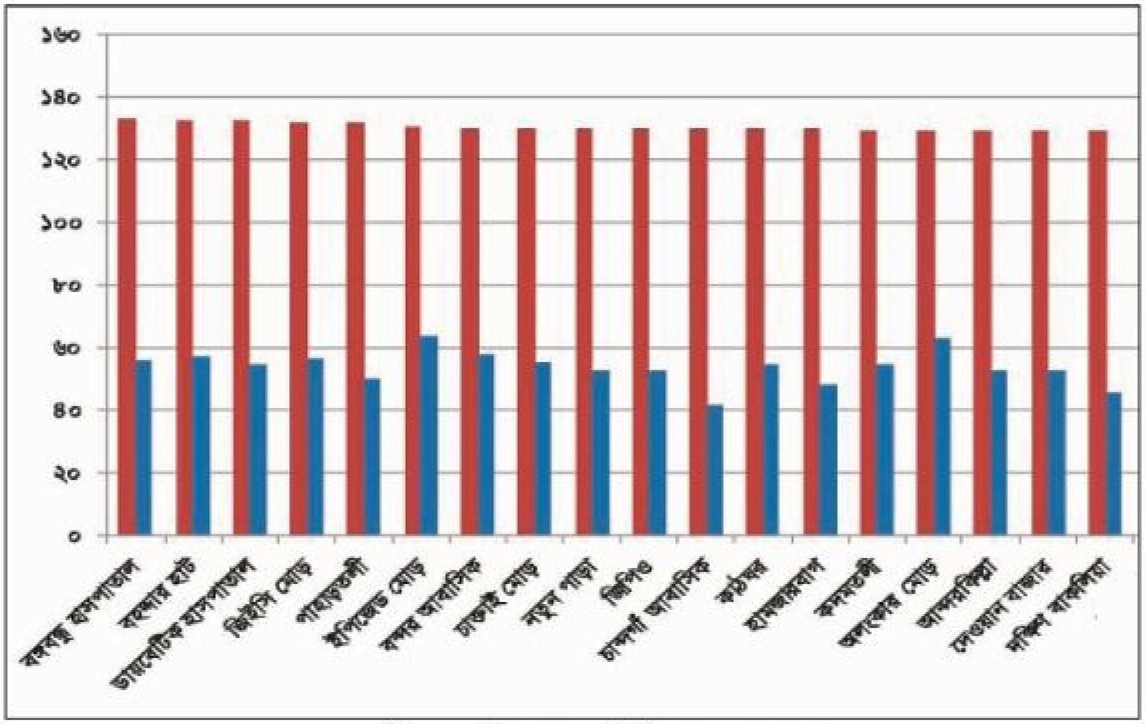

লেখচিত্র ২ : চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

গ. সিলেট মহানগর:

সিলেট শহরে মোট ২০টি স্থানে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে শব্দের মাত্রা (dBA) ভেদে স্থানগুলিকে সাজানোর পাশাপাশি লাল রং দ্বারা সর্বোচ্চ এবং নীল রং দ্বারা সর্বনিম্ন আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা (dBA) বোঝানো হয়েছে।

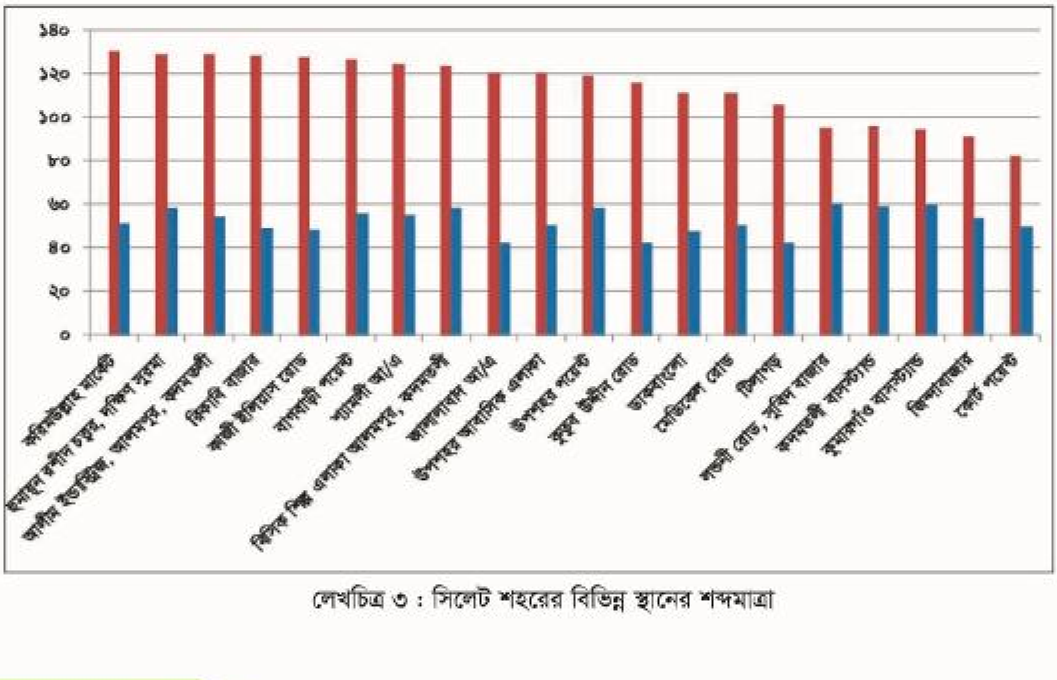

লেখচিত্র ৩ : সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

ঘ. খুলনা মহানগরঃ খুলনা শহরে মোট ২০টি স্থানে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে শব্দের মাত্রা (dBA) ভেদে স্থানগুলিকে সাজানোর পাশাপাশি লাল রং দ্বারা সর্বোচ্চ এবং নীল রং দ্বারা সর্বনিম্ন আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা (dBA) বোঝানো হয়েছে।

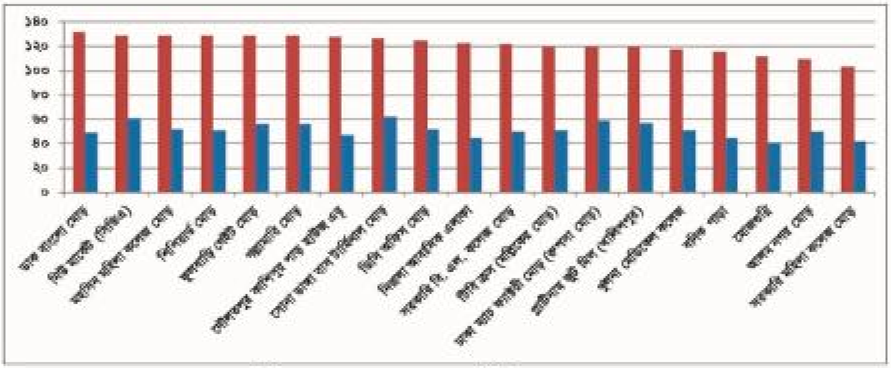

লেখচিত্র ৪ : খুলনা শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

ঙ. বরিশাল মহানগরঃ বরিশাল শহরে মোট ১৫টি স্থানে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে শব্দের মাত্রা (dBA) ভেদে স্থানগুলিকে সাজানোর পাশাপাশি লাল রং দ্বারা সর্বোচ্চ এবং নীল রং দ্বারা সর্বনিম্ন আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা (dBA) বোঝানো হয়েছে।

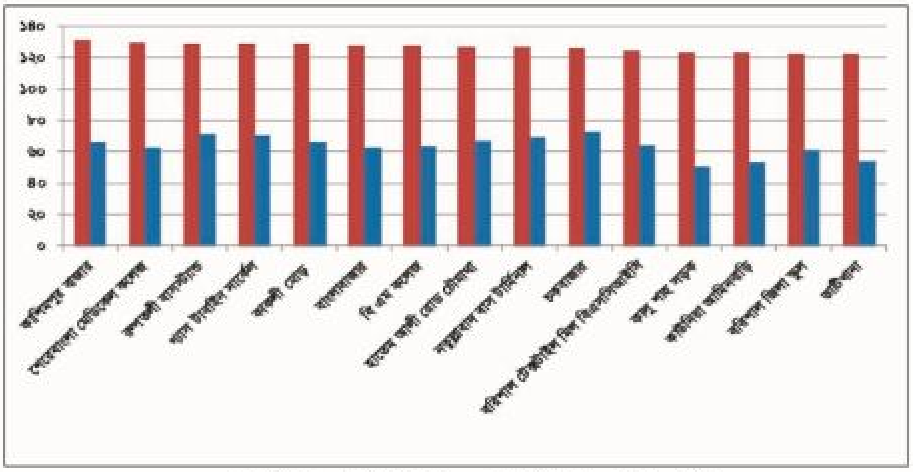

লেখচিত্র ৫ : বরিশাল শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

চ. রংপুর মহানগরঃ রংপুর শহরে মোট ১৫টি স্থানে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে শব্দের মাত্রা (dBA) ভেদে স্থানগুলিকে সাজানোর পাশাপাশি লাল রং দ্বারা সর্বোচ্চ এবং নীল রং দ্বারা সর্বনিম্ন আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা (dBA) বোঝানো হয়েছে।

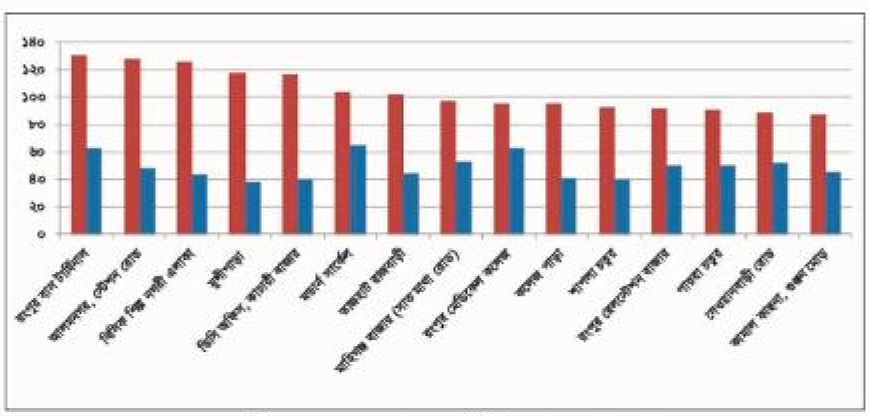

লেখচিত্র ৬ : রংপুর শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

ছ. রাজশাহী ও ময়মনসিংহ মহানগর : রাজশাহী ও ময়মনসিংহ শহরে যথাক্রমে মোট ১০ এবং ১৫টি স্থানে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে শব্দের মাত্রা (dBA) ভেদে স্থানগুলিকে সাজানোর পাশাপাশি লাল রং দ্বারা সর্বোচ্চ এবং নীল রং দ্বারা সর্বনিম্ন আকস্মিক (Impulse) শব্দের মাত্রা (dBA) বোঝানো হয়েছে।

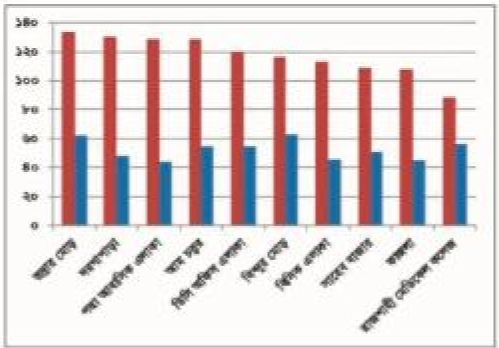

লেখচিত্র ৭ : রাজশাহী শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

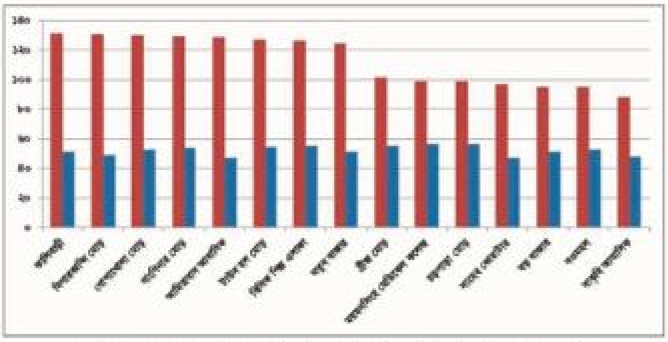

লেখচিত্র ৮ : ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন স্থানের শব্দমাত্রা

প্রতিটি শহরেই শব্দের উৎস হিসেবে যানবাহন এবং হর্ন শব্দদূষণের জন্য প্রধানত দায়ী। এছাড়া নির্মাণ কাজ, সামাজিক অনুষ্ঠান, মাইকিং, জেনারেটর, কল-কারখানা ইত্যাদি শব্দদূষণের উৎস। হর্ণ গণনা করে কোন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর চিত্র পাওয়া গেছে, যেমন- ময়মনসিংহের "ব্রিজ মোড়" এলাকায় ১০ মিনিটে ৯৩৫টি হর্ন বাজাতে দেখা যায়, যার মধ্যে ৩৯৫টি হাইড্রোলিক হর্ন ছিল।

৫. ইতিবাচক পরিবর্তন:

কর্মসূচি এর কার্যক্রমের ফলে বেশকিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে (১) খুলনা শহরের একটি বিদ্যালয়ে ঘন্টা বাজানোর সময় এয়ারমাফ ব্যবহার করা হয়; (২) রাজধানী ঢাকা শহরের ইকবাল রোড-স্যার সৈয়দ রোডকে এলাকাবাসীর উদ্যোগে হর্নমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে; (৩) রাজধানী শহরের কাকরাইল এলাকায় বিচারপতি ভবনের সামনের ফুটপাতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক "হর্ন বাজানো নিষেধ" বার্তা সম্বলিত সাইনপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ৮ : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক "হর্ন বাজানে নিষেধ" বার্তা সম্বলিত সাইনপোস্ট স্থাপন

চতুর্থ অধ্যায়

এনফোর্সমেন্ট ও রাজস্ব কার্যক্রম

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। মূলত পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী একটি সংস্থা। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর ৭ ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তা আদায়ের বিধান রয়েছে। এটি Polluters Pay Principle নামে বহুল পরিচিত। পরিবেশ সংরক্ষণে এটি একটি উত্তম কৌশল। উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতি অধিকমাত্রায় বিরাজমান। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং ব্যাপকমাত্রার পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনের উক্ত ধারার আওতায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আরোপসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট শাখা রয়েছে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি:

পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করছে। এ সংক্রান্ত উক্ত আইনের বিধান নিম্নরূপ:

ধারা ৭(১): প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ: মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতি সাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ১৯(২) ক্ষমতা অর্পণ: মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০)-০এর ধারা ১৯ এর উপ-ধারা ২ মোতাবেক একই আইনের ধারা ৭ এবং ধারা ৯ এর ক্ষমতা মহাপরিচালক মহোদয় সদর দপ্তরের পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) এবং চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কার্যলয়ের পরিচালক-কে অর্পণ করেছেন।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- প্রকৃত পরিবেশ দূষণকারীদের চিহ্নিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের আইনের আওতায় এনে ক্ষতিপূরণ আদায়;
- পরিবেশ আইন প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য:

- আকস্মিক অভিযানের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের ঘটনা হাতেনাতে উদঘাটন ও দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়;
- দূষণের প্রকৃতি বিবেচনায় পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ/নদীদূষণ, পাহাড়কাটা, জলাশয় ভরাটসহ অন্যান্য কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ থেকে সরাসরি পরিবেশ দূষণের অভিযোগ গ্রহণ এবং দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরিবেশ দূষণের ঘটনার সংবাদের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা
- তরলবর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
- পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা;

- পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ মজুদ ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদনকারীর বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- বিভিন্ন দূষণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান যাদের আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে প্রয়োজনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ অন্যান্য সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম গ্রহণ;

ক্ষতিপূরণ ধার্যের ভিত্তি ঃ

দূষণের ধরন এবং মাত্রা বিবেচনা করে মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। উক্ত আদেশের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এটি মূলতঃ বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে Polluters Pay Principle অনুসরণ করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াঃ

কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দূষণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এবং মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত লাল/কমলা-খ/কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহ মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ সংঘটিত হচ্ছে মর্মে কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুনানীতে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য এবং শুনানীতে উপস্থিত কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে পরিবেশ দূষণ সংঘটিত হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং তা পরিশোধের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

জুলাই, ২০১৬ - জুন, ২০১৭ সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের এনফোর্সমেন্ট অভিযানের তথ্য চিত্র

এক নজরে মোট তথ্য :

অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা	:	**১০৪৯টি (সমগ্র বাংলাদেশ)**
ক্ষতিপূরণ ধার্য	:	**১৮.৯৩ কোটি টাকা**
ক্ষতিপূরণ আদায়	:	**১৪.৩৩ কোটি টাকা**
শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানার সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন	:	**২৫৮টি**
অবৈধ ইট ভাটা উচ্ছেদ	:	**৬টি**
অবৈধ কারখানা উচ্ছেদ	:	**১২টি**
কারখানা সিলগালাকরণ	:	**২৫টি**

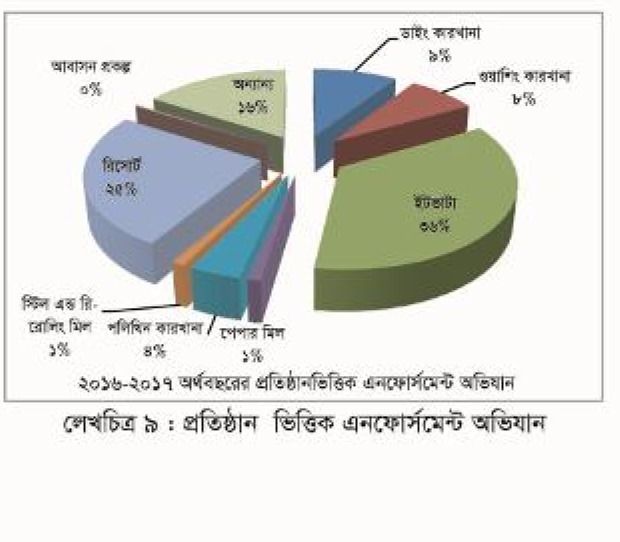

লেখচিত্র ৯ : প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট অভিযান

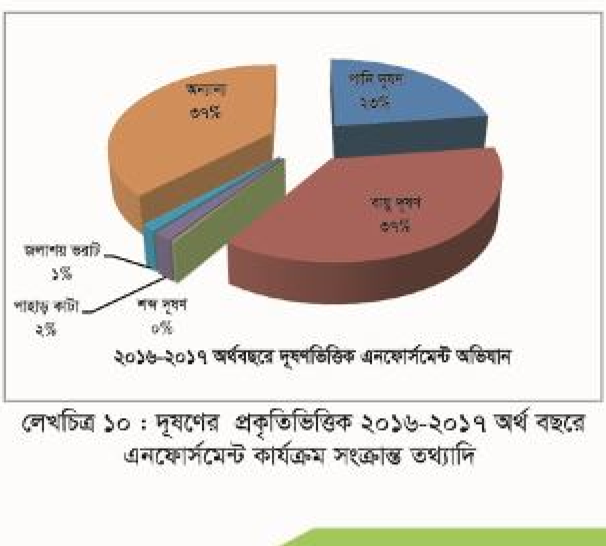

লেখচিত্র ১০ : দূষণের প্রকৃতিভিত্তিক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি

চিত্র ৯ : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (সমগ্র বাংলাদেশ)

অর্থ বছর ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়	পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মোবাইল কোর্টে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দণ্ড		আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	অনাদায়ী অর্থের পরিমান (অনাদায়ী থাকার কারণ)	জব্দকৃত মালামালের পরিমাণ
			অর্থ দণ্ড	কারাদণ্ড			
১। অবৈধ পলিথিন	৬২৯	১৩৩৬	১,১৮,৭৫,৪০০/-	দণ্ডিত অর্থ পরিশোধ না করায় ১ জন আসামীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান	১,১৬,৭৫,৪০০/-	২,০০,০০০/-	১৫২.৭৪১ টন পলিথিন
২। যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া	৬১	২৭৯	৪,৬৫,৮০০/-	-	৪,৬৫,৮০০/-	০	২৬৯টি হর্ন
৩। ইট ভাটা	১১৬	২৭৯	১,৯০,৮৬,০০০/-	-	১,৯০,৮৬,০০০/-	০	প্র/ন
৪। পাহাড় কর্তন	২৮	১৪	২,৪০,০০০/-	১ জনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড	১,৪০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৪ টি ড্রাম ট্যাক, ২ টি সাবল, ৪ টি কোদাল ও ৪ টি বেলচা
৪। জলাশয়/পুকুর ভরাট	৩	২	৩০,০০০/-	-	৩০,০০০/-	০	প্র/ন
মোট	৯৬৭	২৫০৬	৩,১৬,৯৭,২০০/-	-	৩,১৩,৯৭,২০০/-	৩,০০,০০০/- (দণ্ডিত অর্থ আসামী কর্তৃক পরিশোধ করা হয়নি)	

পরিবেশ বিষয়ক মামলা ও রিট

পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার জন্য সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ জারিপূর্বক দেশে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট-এ ৩ (তিন) টি পরিবেশ আদালত এবং ১৯টি জেলায় পরিবেশ বিষয়ক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম চালু রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে দেশের আরো ২৫টি জেলায় পরিবেশ আদালত এবং ০৭টি বিভাগীয় শহরে পরিবেশ আপিল আদালত প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

অপরদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরিবেশ অধিদপ্তর বা সরকারের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মহামান্য আদালত কিছু কার্যক্রম গ্রহণে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের কার্যক্রমের বছরভিত্তিক একটি তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো :

টেবিল ৩ : পরিবেশ অধিদপ্তর/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশনের পরিসংখ্যান

বছর	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
২০০৯ পর্যন্ত	২৩৭
২০১০	৫৩
২০১১	১০২
২০১২	৯৩
২০১৩	৪৫
২০১৪	৯৪
২০১৫	৯৮
২০১৬	১২২
২০১৭ (জুন পর্যন্ত)	৯৫
মোট	৯৩৯

রাজস্ব কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে কাজ করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর সরকারের রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান নয়। তথাপিও পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নকরণ এবং গবেষণাগারে বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ বাবদ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক নির্ধারিত ফি আদায় এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। নিম্নের সারণিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী প্রদান করা হলো:

টেবিল ৪ : পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়-ব্যয়

অর্থ বছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০২-২০০৩ হতে ২০১১-২০১২	১০৪.৬০	৭৪.৯২
২০১২-২০১৩	৭০.৮৪	২২.০২
২০১৩-২০১৪	৫৯.৪৭	২০.৮৪
২০১৪-২০১৫	৫৭.১৭	২৩.৩৮
২০১৫-২০১৬	৫২.৭০	২৯.৯৮
২০১৬-২০১৭	৫৩.২৭	৩২.৮৯
মোট	৩৯৮.০৫	২০৩.৯৬

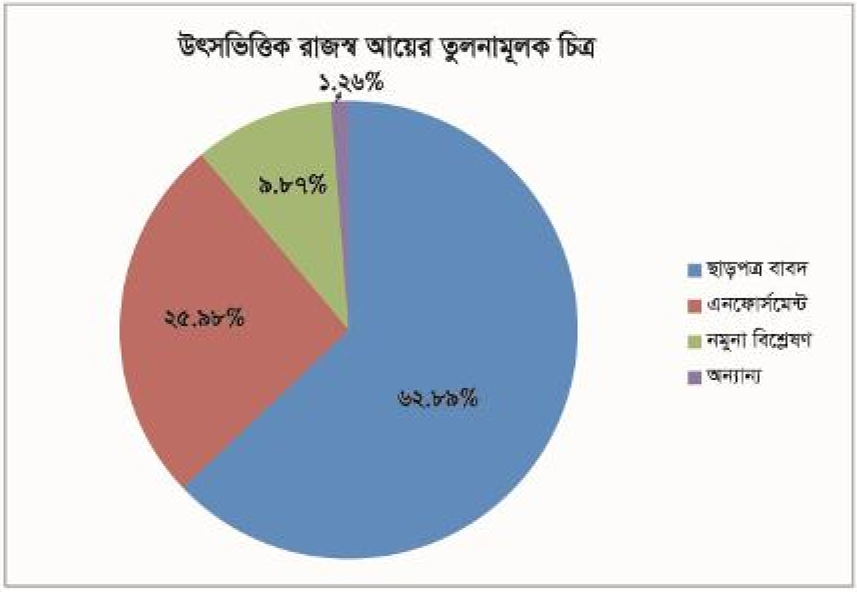

লেখচিত্র ১১ : বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন ফি-এর অর্থ। এ খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩৩.৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। অপরদিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করা হয় ১৩.৮৪ কোটি টাকা, গবেষণাগারের নমুনা বিশ্লেষণ ফি বাবদ ৫.২৬ কোটি এবং অন্যান্য খাতে আদায় হয় ০.৬৭ কোটি টাকা।

হাজারীবাগ ট্যানারী কারখানা বন্ধকরণ কার্যক্রম

- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মোকদ্দমা নং-৮৯১/১৯৯৪-এর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও হাজারীবাগস্থ ট্যানারী কারখানাসমূহ সাভারের হরিণধরা ট্যানারী শিল্প নগরীতে যথাসময়ে স্থানান্তর না করায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ০৬.০৩.২০১৭ তারিখের আদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ঢাকার হাজারীবাগস্থ ট্যানারী কারখানাগুলো বন্ধের নির্দেশ প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদেশ বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইজিপি ও ডিএমপি-এর পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করেন।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ০৬.০৩.২০১৭ তারিখের আদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারিসমূহের সেবা সংযোগ (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন) বিচ্ছিন্ন করে ট্যানারী কারখানাসমূহকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে ০৬.০৪.২০১৭ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (Compliance Report) প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন মোকদ্দমা নং ৮৯১/১৯৯৪ এর গত ০৬.০৩.২০১৭ তারিখের আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাজারীবাগস্থ ট্যানারী কারখানা মালিকদের দুটি এসোসিয়েশন যথা বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার ও লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএলএলএফইএ)-এর সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহামান্য উচ্চতর আদালতের আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য তাঁদের সহযোগিতা চাওয়া হয়।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ডিএমপি, ডিপিডিসি, তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, বিটিসিএল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা জেলা, বিসিক, রাজউক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে হাজারীবাগস্থ ট্যানারী কারখানাসমূহের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের বিষয়ে স্ব স্ব সংস্থার প্রণীত কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নিয়ে কয়েক দফা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ০৪/০৪/২০১৭ তারিখে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীসমূহের টেলিফোন সংযোগ বিটিসিএল কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করা হয়, যা প্রতিবেদন আকারে ০৬.০৪.২০১৭ তারিখ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে আংশিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন এফিডেভিট আকারে দাখিল করা হয়।

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারীসমূহের সেবা সংযোগ (টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি) বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান শুরু হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের ৩ জন পরিচালকের নেতৃত্বে ৫ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ডিপিডিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিটিসিএল এবং বিসিক-এর সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর এ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। অভিযানকালে ওয়াসা কর্তৃক ট্যানারীসমূহের ১৯৩টি পানির সংযোগ, তিতাস কর্তৃক ৫৪টি গ্যাস সংযোগ এবং ডিপিডিসি কর্তৃক ২২৪টি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় যা প্রতিবেদন আকারে গত ০৯.০৪.২০১৭ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে এফিডেভিট আকারে Compliance Report দাখিল করা হয়েছে। অভিযানকালে ট্যানারী মালিক ও ট্যানারী সংশ্লিষ্ট সমিতির নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা পাওয়া গেছে। অভিযানের সময় উপস্থিত থেকে সকল বিষয় তদারক করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল।

চিত্র ১০ : হাজারীবাগ ট্যানারিসমূহের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম

প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন
করোনা কখনো খণ্ডন

কক্সবাজার ইসিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সৃজিত 'ম্যানগ্রোভ' বন

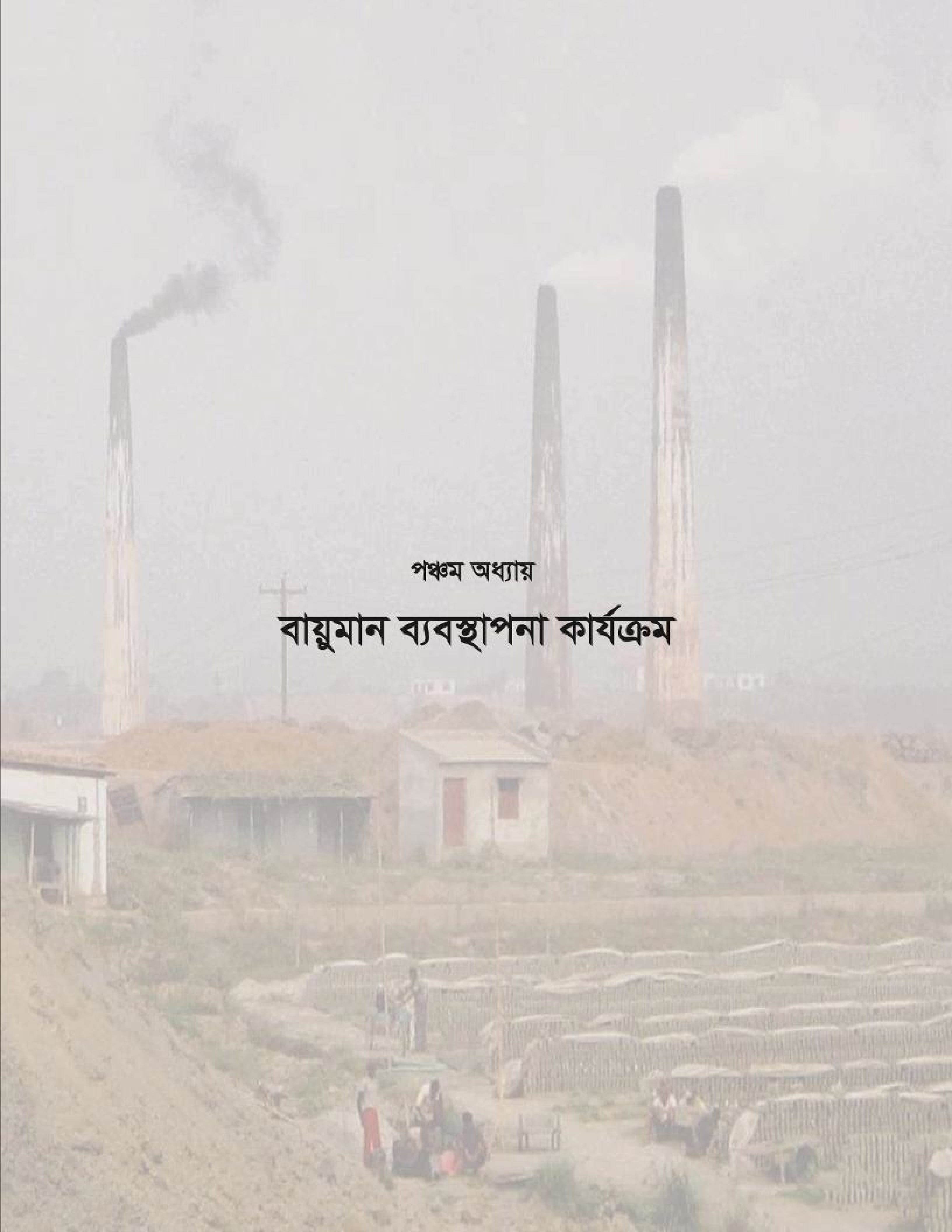

পঞ্চম অধ্যায়

বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই বায়ুদূষণ বাংলাদেশের অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। বর্ধিত জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ, যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে এসকল উৎস সৃষ্ট দূষকের কারণে বায়ুদূষণের মাত্রাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা "হেলথ এফেক্টস ইনস্টিটিউট এন্ড ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স এন্ড ইভালুয়েশন" এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত "বৈশ্বিক বায়ুদূষণ পরিস্থিতি-২০১৭" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বায়ুদূষণে চীন ও ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। আরো বলা হয়েছে, বায়ুদূষণের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লাখ ২২ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যু ঘটে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে শতকরা ৮৯ শতাংশ বাড়িতে ব্যবহৃত কয়লা ও জ্বালানী কাঠ দিয়ে রান্নার কাজে সৃষ্ট ধোঁয়া ও তাপে ঘরের ভিতরেও বায়ুদূষণ হয়। জাতিসংঘ শিশু তহবিল- ইউনিসেফ এর "ক্লিয়ার দ্য এয়ার অব চিলড্রেন: দ্য ইমপ্যাক্ট অব এয়ার পলুশন অন চিলড্রেন" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাড়ির ভেতরে বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে শিশুর মৃত্যুঝুঁকি বেশি। উন্নত রান্নার চুলা ব্যবহার তুলনামূলকভাবে সীমিত হওয়ার কারণে শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। এ সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাবকেও দায়ী করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যে বিভিন্ন প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে, তার মধ্যে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অন্যতম। এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে। বাংলাদেশে বায়ুদূষণের যে সমস্ত উৎস রয়েছে তার মধ্যে ইটভাটা, যানবাহন, শিল্পকারখানা, রাস্তার ধুলাবালি, বায়োমাস পোড়ানো উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "Bangladesh Air Pollution Studies (BAPS)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে Norwegian Institute for Air Research (NILU) এর সহায়তায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিচালিত ২০১৩-২০১৬ সময়ে বায়ুদূষণের ওপর সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা (PM 2.5) যার প্রধান উৎস হলো সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা যা হতে প্রায় ৫৮% বস্তুকণা নির্গত হয়। এছাড়া যানবাহন থেকে ১০.৪%, রাস্তার ধুলাবালি প্রায় ১৫% বায়োমাস পোড়ানো ৭.৪% এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রায় ৯% বস্তুকণা বাতাসে নির্গত হয়।

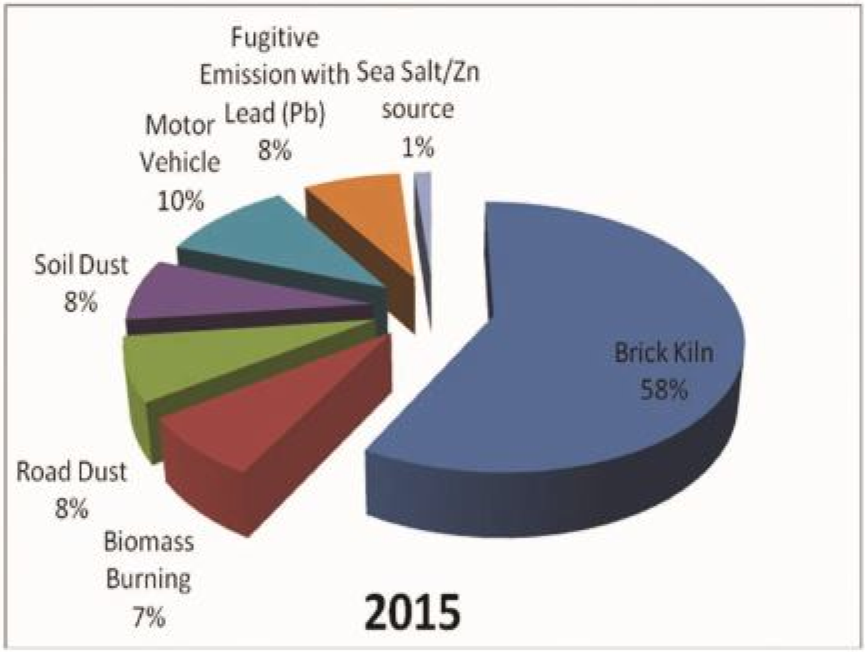

লেখচিত্র ১২ : ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের উৎসসমূহ

ইটভাটা সৃষ্ট বায়ুদূষণ:

পূর্বেই উল্লেখিত বায়ুদূষণ সম্পর্কিত প্রকাশিত সমীক্ষা প্রতিবেদনে ঢাকা শহরে বায়ুদূষণের প্রধান উৎস হিসেবে ইটভাটাকে সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও PM_{10} ইট পোড়ানোর ফলে নির্গত ধোঁয়ায় শুধু নয়, ইটের কাঁচামাল হিসেবে কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি (Top soil) ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বাতাসে ধুলিকণার ও আধিক্য ঘটে যা বায়ুদূষণ বাড়িয়ে দেয়। ইটভাটা সৃষ্ট এই বায়ুদূষণজনিত সমস্যা কার্যকরভাবে হ্রাস করার জন্য "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন

(নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" বিগত ০১ জুলাই ২০১৪ হতে কার্যকর হয়েছে, ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানী কাঠের ব্যবহার এবং ইট প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কৃষি জমি বা পাহাড় বা টিলা হতে মাটি কেটে ইটের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে কতিপয় স্থানে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এই আইন কার্যকর হবার পর নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে ইটভাটা স্থাপনের জন্য কোনোরূপ অনুমতি বা ছাড়পত্র বা লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। এছাড়া মাটির ব্যবহার হ্রাস ও বায়ুদূষণ কমানোর লক্ষ্যে কংক্রিট ব্লক ইট, ফাঁপা ইটসহ আধুনিক প্রযুক্তির ইট প্রস্তুতকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইটভাটার আধুনিকীকরণ:

পূর্বেই উল্লিখিত বায়ুদূষণ সম্পর্কিত প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বায়ুদূষণের প্রধান উৎস সনাতন পদ্ধতির ইটভাটাসমূহকে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ইটভাটায় রূপান্তরের মাধ্যমে বায়ুদূষণ প্রায় ৭০% হ্রাস করা ও ইট উৎপাদনে ৩০% জ্বালানী সাশ্রয় করা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে বিদ্যমান সনাতন পদ্ধতির ১২০ ফুট উচ্চতায় চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটাসমূহকে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং সনাতন পদ্ধতির নতুন ইটভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বন্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত সনাতন প্রযুক্তির ইটভাটাসমূহকে পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তির হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন্ (Hybrid Hoffman Kiln), টানেল কিল্ন্ (Tunnel Kiln) বা পরীক্ষিত অন্য কোন উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করে ইট পোড়ানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময় গণবিজ্ঞপ্তি জারিসহ বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

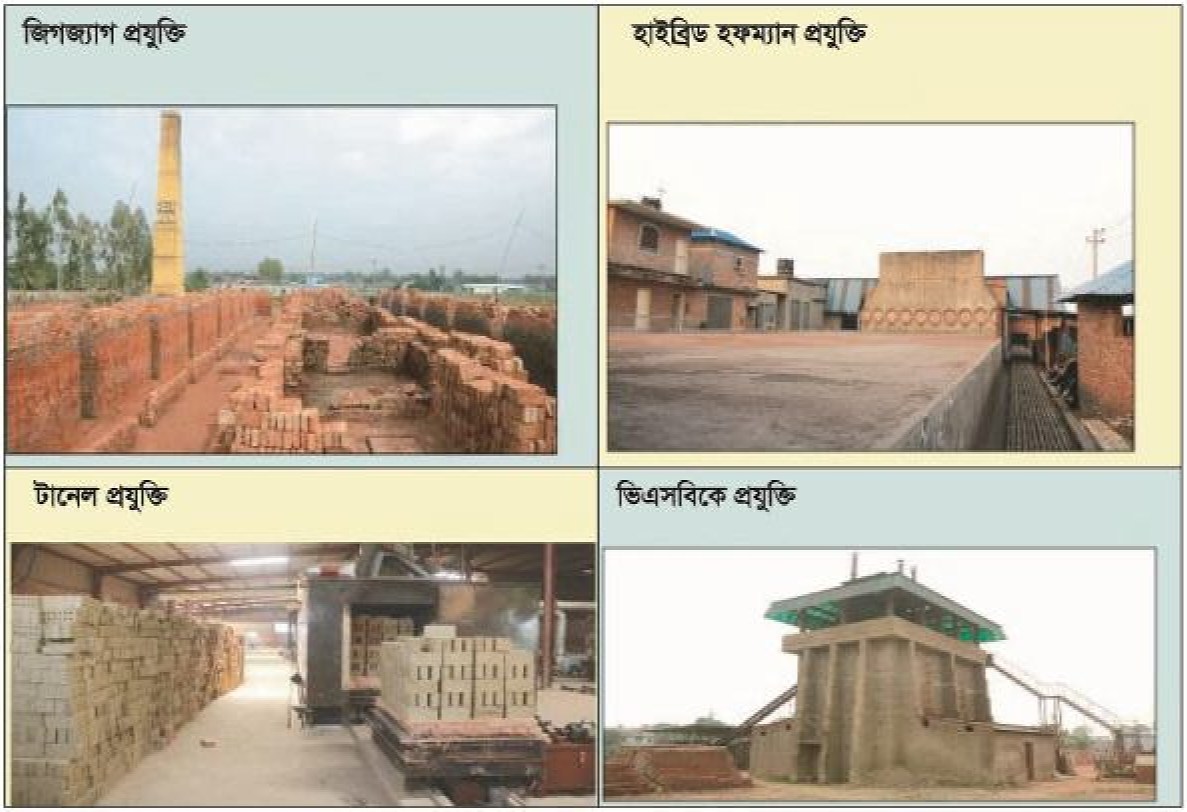

চিত্র ১১ : আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা

আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তর:

ইতোমধ্যে দেশে ৪৩৯০টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৬৫.১৩% ইটভাটা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ইটের ভাটার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেবিল ৫ : বিভাগভিত্তিক ইটভাটার হালনাগাদ তথ্যাদি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

ইটভাটার হালনাগাদ তথ্যাদি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)								
ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ইটভাটার সংখ্যা	ফিক্সড চিমনী (৮০-১২০ফুট)	জিগজ্যাগ/ উন্নত জিগজ্যাগ	হাইব্রিড হফম্যান	অটোমেটিক/ ট্যানেল কিলন	উন্নত অন্যান্য প্রযুক্তি	উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের হার
১.	বরিশাল	৩১৫	১১৩	২০৯	২	০	২	৬৭.৬২%
২.	চট্টগ্রাম	১৪৫৫	৫১৯	৮৭২	২০	২	০	৬১.৪৪%
৩.	সিলেট	২১৪	৪০	১৭৩	১	০	০	৮১.৩১%
৪.	ঢাকা	২৪৪১	৭৯২	১৬২৩	১৭	৪৫	২	৬৯.১১%
৫.	খুলনা	৭৯৬	২৫০	৫৩৫	০	১০	১	৬৮.৫৯%
৬.	রাজশাহী	১৫১৯	৬৫০	৮৫৬	২০	০	০	৫৭.৬৭%
মোট=		৬৭৪০	২৩৬৪	৪২৬৮	৬০	৫৭	৫	৬৫.১৩%

ইটভাটায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:

সনাতন প্রযুক্তির নিষিদ্ধ ইটের ভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ক্ষতিপূরণ ধার্য করে আসছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ইটভাটা বন্ধসহ জরিমানা আদায় করে আসছে।

- অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ আইনের ধারা ৭ প্রয়োগ করে ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৬০৫টি ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ১৪.৪৪৭ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে এবং ১০.৭৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭ সময়ে ২১৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৩,৫০,১২,০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বার হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ৩২ (বত্রিশ) টি ইটভাটা বন্ধ বা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

গণসচেতনতা সৃষ্টি:

বায়ুদূষণ বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশক্রমে অত্র দপ্তরের সকল বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ইটভাটা দূষণসহ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় সভা করা হচ্ছে। ''ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩''-এর আলোকে সর্বমোট ক) পোস্টার ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টি, খ) লিফলেট ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টি, গ) গেজেট ৩,০০০ (তিন হাজার) টি এবং ঘ) গণবিজ্ঞপ্তি ২০,০০০ (বিশ হাজার) টি অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, ইটভাটার মালিক এবং জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টার লাগানো হয়েছে এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বিশেষ টিভি স্পট প্রচার করা হচ্ছে।

আইন সংশোধন:

বাস্তবতার নিরিখে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর কতিপয় ধারায় আংশিক সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবনা তৈরি সংশোধনীর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ:

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বিষয়ক কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে। যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ির ক্ষতিকর ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঢাকা শহরের

বিভিন্ন লোকেশনে ২০১৬-১৭ সময়ে সারাদেশে মোট ৫৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোট ৪২৮টির অধিক মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ, ফলাফল বিশ্লেষণ ও ৩,২৫,৮০০/- (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

ডিজেল চালিত যানবাহন থেকে সালফারের দূষণ হ্রাসে Road Map - প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজেল সালফারের মানমাত্রা ৫০০০ পিপিএম থেকে ৫০০ পিপিএম-এ হ্রাস করা হয়েছে।

চিত্র ১২ : পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত যানবাহন নিঃসরিত কালো ধোঁয়ার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম

বায়ুদূষণ মনিটরিং কার্যক্রম

- পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের বায়ুদূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (Clean Air & Sustainable Environment- CASE)- প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের অধীন বায়ুদূষণ মনিটরিং, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ০৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী ও খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু রয়েছে। এই সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার-ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে। বস্তুকণা পরিমাপের আওতায় এসপিএম, পিএম১০, পিএম২.৫ পরিবীক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর মানের অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত, বায়ুদূষণ কার্যক্রমকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও সাভারের আশুলিয়ায় পাঁচটি সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন স্থাপনের জন্য লোকেশন নির্ধারণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সাতক্ষীরায় স্থাপিত আন্তঃদেশীয় বায়ুদূষণ মানিটরিং স্টেশন বায়ু ও বৃষ্টির পানির নমুনা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ও সালে সচিবালায়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

Existing & Proposed Air Monitoring Network In Bangladesh
Location Map of all CAMS sites

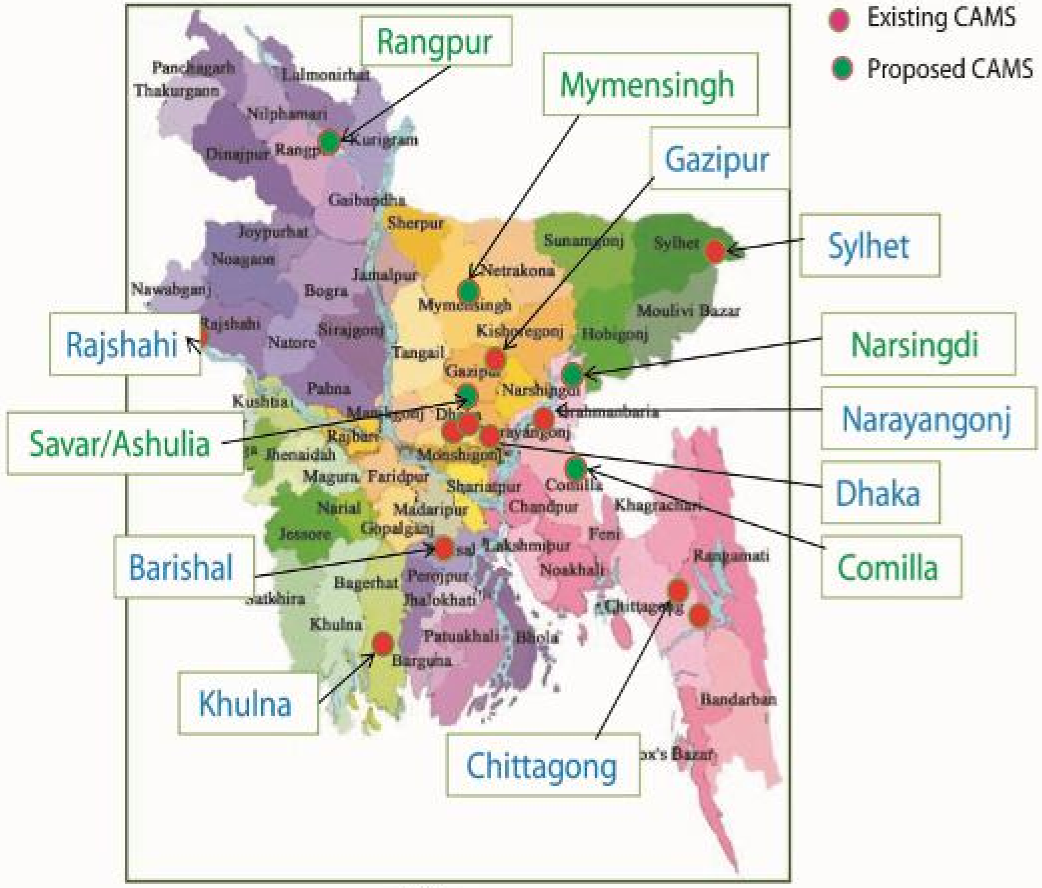

মানচিত্র ২ :

Central Data Acquisition System

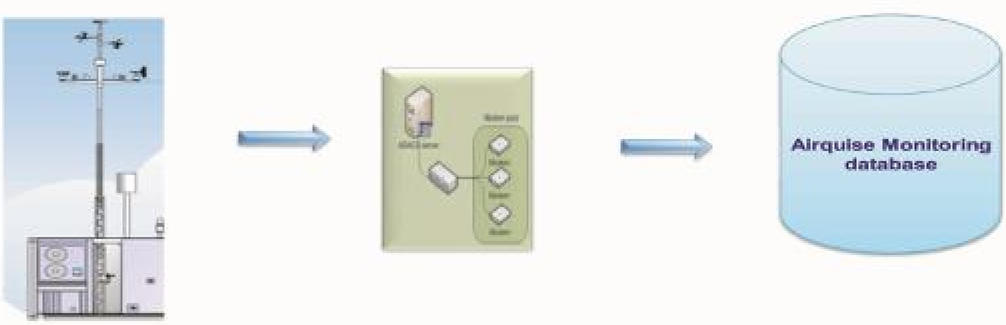

চিত্র ১৩ : CAMS (Continious Air Monitoring Station)

- সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা ১০ ও বস্তুকণা ২.৫ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে এবং প্রায়শই বিধিবদ্ধ বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হল শুষ্ক মৌসুমে ইটের ভাটাসমূহ চালু হয়, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের গতিবেগ কম থাকে। এই কারণে রাস্তাঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যায়। কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে।

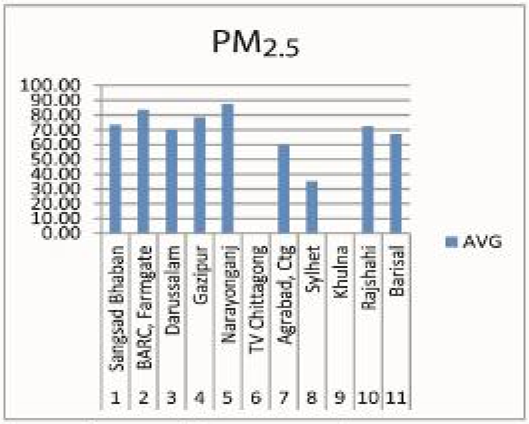

লেখচিত্র ১৩ : বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত $PM_{2.5}$ Annual Concentration (2016)

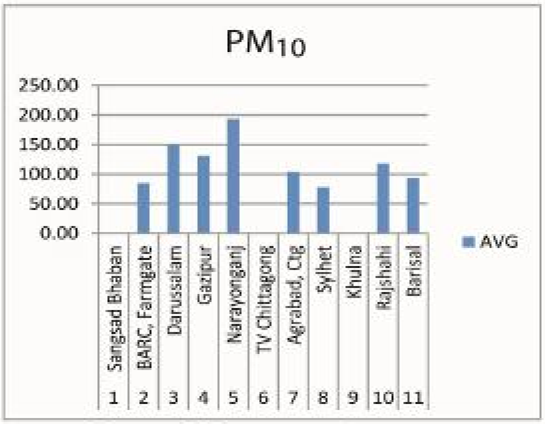

লেখচিত্র ১৪ : বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত PM_{10} Monthly Concentration, 2016

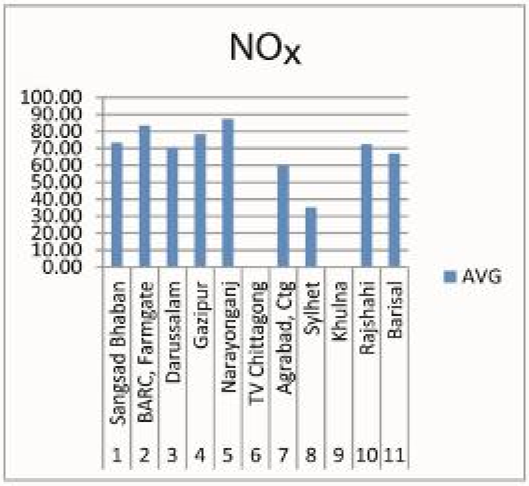

লেখচিত্র ১৫ : বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে NO_X Annual Concentration(2016)

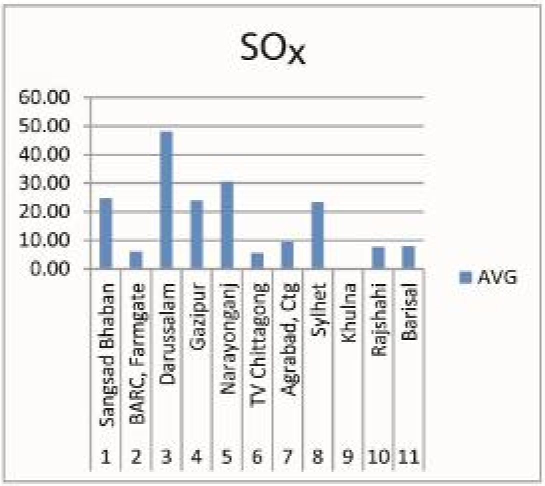

লেখচিত্র ১৬ : বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে SO_X Annual Concentration,

বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশের ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক Air Quality Index (AQI) কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (case.doe.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। পরবর্তিতে বায়ুমান সূচক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে। বায়ুমান সূচকের মাধ্যমে জনগণ বায়ুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এতদ্ব্যতীত, জনগণের মধ্যে বায়ুদূষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ০২টি টিভিস্পট বিভিন্ন টিভিস্পট চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে এবং কয়েক ধরনের প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুত করে দেশব্যাপী বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে।

Table 6 : Air Quality Index (AQI) Scheme for Bangladesh

AQI Value	Level of Health Concern (স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের অবস্থান)		Colours
	English	বাংলা	
0 - 50	GOOD	ভাল	GREEN
51 -100	MODERATE	মধ্যম	YELLOW GREEN
101 -150	CAUTION	সাবধানতা/সতর্কীকরণ	YELLOW
151 – 200	UNHEALTHY	অস্বাস্থ্যকর	ORANGE
201 – 300	VERY UNHEALTHY	খুব অস্বাস্থ্যকর	RED
301 – 500	EXTREMELY UNHEALTHY	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর	PURPLE

টেবিল ৭ : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৯ জুলাই ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বায়ুর মানমাত্রা

Pollutant	Objective	Averaging Time
CO	10 mg/m3; (9 ppm)	8-hour
	40 mg/m3; (35 ppm)	1-hour
Lead	0.5 µg/m3	Annual
NO_2	100 µg/m3; (0.053 ppm)	Annual
PM_{10}	50 µg/m3	Annual
	150 µg/m3	24-hour
$PM_{2.5}$	15 µg/m3	Annual
	65 µg/m3	24-hour
SPM	200 µg/m3	8-hours
Ozone	235 µg/m3; (0.12 ppm)	1-hour
	157 µg/m3; (0.08 ppm)	8-hour
SO_2	80 µg/m3; (0.03 ppm)	Annual
	365 µg/m3; (0.14 ppm)	24-hour

National Ambient Air Quality Standards

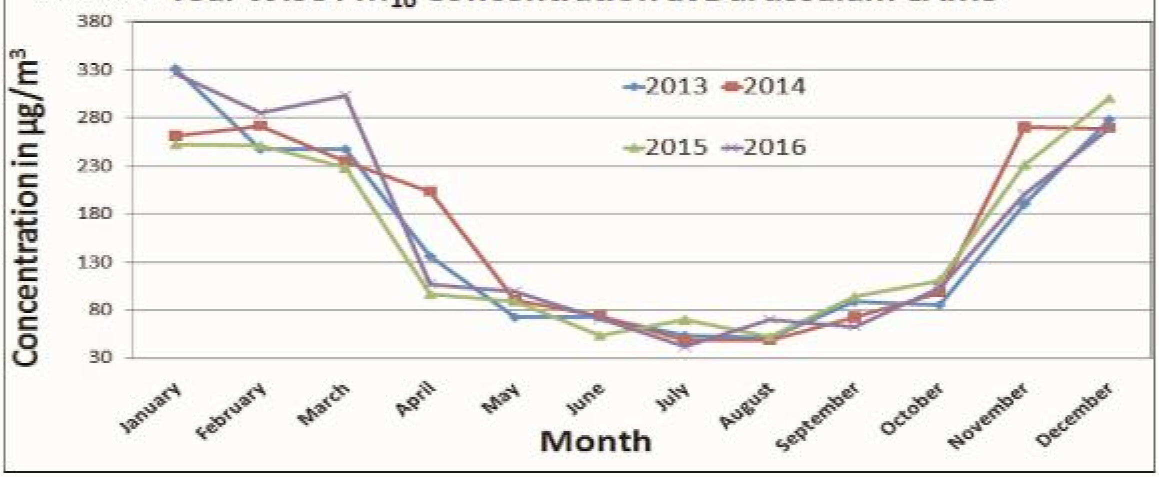

লেখচিত্র ১৭ : Year Wise PM_{10} Concentration at Darussalam CAMS

সূত্র: CASE- প্রকল্প, পরিবেশ অধিদপ্তর

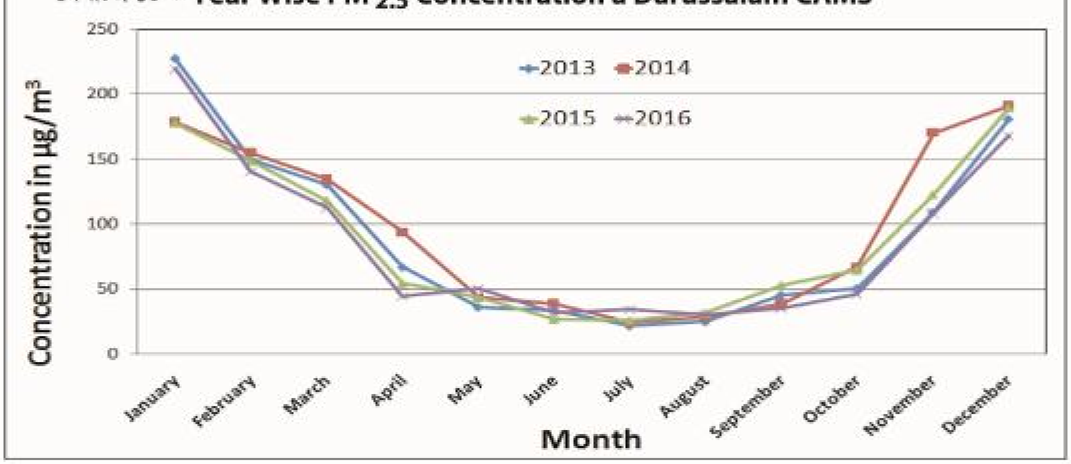

লেখচিত্র ১৮ : Year Wise $PM_{2.5}$ Concentration a Darussalam CAMS

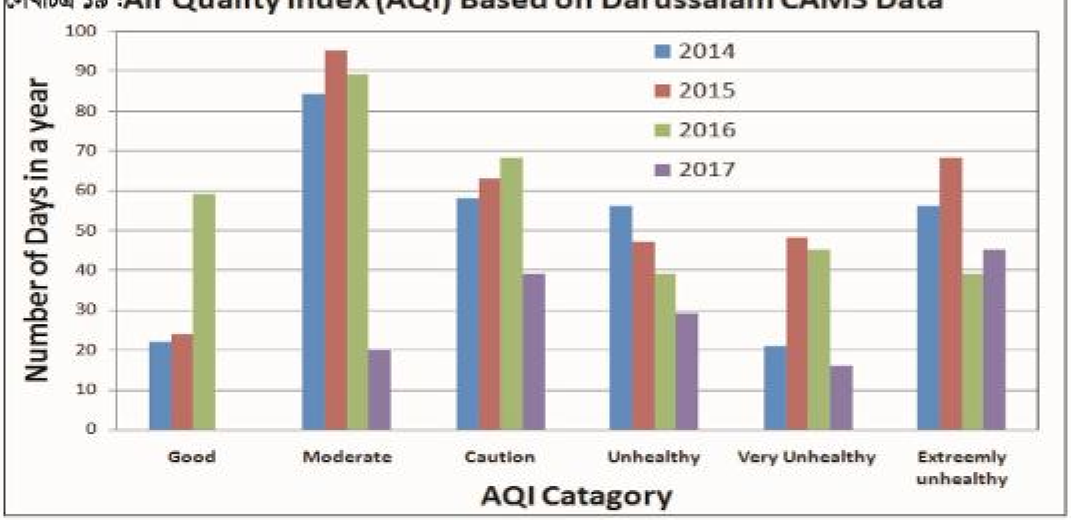

লেখচিত্র ১৯ :Air Quality Index (AQI) Based on Darussalam CAMS Data

Source: Case project

টেবিল ৮ : বায়ুদূষণের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব

Sources and Potential Health Impact of Air Pollutants

Pollutant	Sources	Health effects
Carbon Monoxide (CO)	Exhaust gases from motor vehicles, inner sources including kerosene and wood stoves.	Headaches, reduced mental awareness, hearth attack, cardiovascular diseases, fetal development disorders, death.
Sulphur dioxide (SO_2)	Thermal coal plants, oil refineries, Brick Kiln ,sulfuric acid production and smelting ores containing sulfur	Eye irritation, eye watering, weight in chest, shortness of breath, lung damage.
Nitrogen dioxide (NO_2)	Motor vehicles, electric facilitates and other industrial, commercial and residential facilities combusting liquid fuels.	Susceptibility to respiratory infections, lung irritation and respiratory symptoms (for example cough, chest pain, difficulties breathing).
Ozone (O_3)	Exhaust gases from vehicles and other smoke releases. Formed from other pollutants with solar light.	Eye and throat irritation, cough, respiratory tract problems, asthma, lung damages.
Particulate Matter (PM)	Brick Kiln, Diesel engines, thermal plants, industries, dust scattered by wind, wood stoves.	Eye irritation, asthma, bronchitis, lung damage, cancer, heavy metals poisoning, effects on the cardiovascular system

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত ছক ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত দেশি ও বিদেশি প্রতিবেদনের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাব শুধু জনস্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা নয়, সামগ্রিক পরিবেশকে বসবাসের অনুপযোগী করে তোলে। আর এ ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর সীমিত জনবল নিয়ে কাজ করে চলেছে। এ লক্ষ্যে Clean Air Act প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যা প্রণীত ও অনুমোদিত হলে আইনানুগভাবে বায়ুদূষণ রোধের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ হবে। ইটভাটা ও রিরোলিং মিল হতে সৃষ্ট দূষণ রোধকল্পে দেশব্যাপী একটি GIS Based তথ্য সম্বলিত ডাটাসেট তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। ইটের বিকল্প হিসেবে অপোড়ানো (Non fired) ইট প্রস্তুতের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে যা হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহিত যৌথভাবে ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভবিষ্যতে পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

বায়ুদূষণ রোধকল্পে অন্যান্য প্রকল্পসমূহ:

বন্ধু চুলা প্রকল্প

অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ রোধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও GIZ-এর অর্থায়নে সারা দেশে "বন্ধু চুলা প্রকল্প" বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রায় ৫ লক্ষ বন্ধু চুলা বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের অর্থায়নে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) "Improved Cooked Stove" বিতরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

Strengthening Institutional Capacity to Reduce Short Lived Climate Pollutants প্রকল্প

বায়ুমণ্ডলে স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষক (SLCP) বিশেষ করে ব্ল্যাক কার্বন, ট্রপোস্ফেরিক ওজোন এবং মিথেন এর পরিমাণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমিয়ে আনা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষার জন্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে UNEP এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর Strengthening Institutional Capacity to Reduce Short Lived Climate Pollutants (SLCPs) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক. বাংলাদেশে স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষক (SLCPs) হ্রাসকরণের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় বৃদ্ধি।
খ. স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষক (SLCPs) হ্রাসকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা।
গ. Climate and Clean air Coalition (CCAC) এর বিভিন্ন উদ্যোগ/কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

কার্যক্রম-১ : SLCPs ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে SLCPs প্রশমনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর টেকসই উন্নতি।
কার্যক্রম-২ : SLCPs প্রশমনে জাতীয় পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণ।
কার্যক্রম-৩ : জাতীয় SLCP পরিকল্পনা শক্তিশালীকরণ এবং উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন।
কার্যক্রম-৪ : SLCP প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়ন, মেইনস্ট্রিমিং ও বাস্তবায়ন।
কার্যক্রম-৫ : CCAC কার্যক্রম/উদ্যোগ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ।

পরিবেশ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন রিও প্রকল্প

বিশ্বব্যাপী আমরা বর্তমানে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি, তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, ভূমির অবক্ষয় এবং মরুময়তা অন্যতম। বিশ্বব্যাপী এই চ্যালেঞ্জসমূহ সঠিক ও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন অংশীজনদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনা। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, মরুময়তা এবং ভূমির অবক্ষয় সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায় ১৯৯২ সালে এগিয়ে এসেছিল (যা রিও কনভেনশন নামে বহুল পরিচিত)। বাংলাদেশ তখন থেকেই এ যাত্রার সঙ্গী। বাংলাদেশ তিনটি রিও কনভেনশনের অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে তার প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই তিনটি কনভেনশন হচ্ছে- ক) United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD), L) United Nations Framework Conventionon Climate Change (UNFCCC) Ges M) United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)| কিন্তু এই তিনটি কনভেনশনের ক্ষেত্রে যেটুকু অর্জন দরকার ছিল তা পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে তিনটি কনভেনশনের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব। এ অভাব শুধু ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিদ্যমান। তাই এই তিনটি কনভেনশনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা বিশ্ব সম্প্রদায় উপলব্ধি করছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভূমির অবক্ষয় রোধে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ন্যাশনাল ক্যাপাসিটি সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট ২০০৭ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রিও কনভেনশনসমূহের অধীনে প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে করণীয় অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছে। সে অগ্রাধিকারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মরুময়তা ও ভূমির অবক্ষয় রোধের লক্ষ্যে মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

উপর্যুক্ত বাস্তবতার আলোকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি উপলব্ধি করেছে যে, রিও কনভেনশনসমূহের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য রিও কনভেনশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে।

এ প্রেক্ষাপটে, বৈশ্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশনসমূহ (রিও কনভেনশনসমূহ) বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ (জিইএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর **"ন্যাশনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টিং রিও কনভেনশনস থ্রু এনভায়রনমেন্টাল গভর্ন্যান্স (রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প)"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে, যা সংক্ষেপে রিও প্রকল্প নামে পরিচিত। এই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো :

১ রিও কনভেনশনসমূহকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ও পরীক্ষাপূর্বক প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ধারণ করা এবং সে আলোকে রিও কনভেনশনসমূহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রমে যথাযথ অন্তর্ভুক্তি;

২ হালনাগাদকৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রমের আলোকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৩ রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েব সাইটের ব্যবহারসহ শিক্ষা ও প্রচারণাধর্মী বিভিন্ন উপকরণ তৈরি;

৪ রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

৫ রিও কনভেনশনসমূহকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্লান-এ অঙ্গীভূত করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বৈশ্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশনসমূহ (রিও কনভেনশনসমূহ) বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর "ন্যাশনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টিং রিও কনভেনশনস থ্রু এনভায়রনমেন্টাল গভর্ন্যান্স (রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প)" শীর্ষক প্রকল্পটির Inception Workshop অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৪০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ মডিউল পর্যালোচনার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর সাথে কনসালটেশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং মডিউলে তিনটি কনভেনশনকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

রিও কনভেনশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় শিশু-কিশোরদের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ০৮টি মন্ত্রণালয় ও ১৬টি বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবর্গের অংশগ্রহণে নলেজ শেয়ারিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত, এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও তিনটি কনভেনশন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন লিফলেট, ফ্লায়ার, পোস্টার প্রণয়ন করা হয়।

রিও কনভেনশনসমূহকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে অঙ্গীভূত, তিনটি কনভেনশনের Best Practice Report তৈরি এবং রিও কনভেনশনসমূহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র ১৪ : রিও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত ইনসেপসন ওয়ার্কসপ

ষষ্ঠ অধ্যায়

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শত শত নদী দেশের ভূখণ্ডে শিরা-উপশিরার মতো বয়ে চলেছে। নদী হতে আমরা সেচের পানি, মৎস্য সম্পদ, পানীয়জল, নৌপরিবহন, শিল্পায়ন এবং অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকি। বাংলাদেশের নদী ও প্লাবনভূমি বিভিন্ন রকম জলজীবনের আবাসস্থল। বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ বাড়ে এবং শীতকালে নদীতে পানির প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। কখনও নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। নদীতে পানির প্রবাহ নির্ভর করে ঋতু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও উজানের প্রবাহের ওপর।

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। এছাড়াও হোটেল-রেস্তোরার খাবার পানির মান নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ২৮টি নদীর ৬৪টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করে। মনিটর প্যারামিটারগুলি হলোঃ P^H, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity and Total alkalinity. পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের River Water Quality Report প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের River Water Quality Report প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উল্লিখিত প্যারামিটার অনুসারে মনিটরিং ফলাফল হতে দেখা যায় যে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বড় বড় নদী যেমন: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। DO, BOD এবং COD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীর পানিতে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্য থাকে।

২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে উচ্চ মাত্রার P^H ৭.৭৯ (Figure-1a) EQS বা মৎস চাষে ব্যবহারে পানির P^H মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO এর পরিমান EQS অপেক্ষা কম (প্রায় শূন্য) থাকে কিন্তু বর্ষা মৌসুমে DO এর পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বাধিক DO ৬.২ মি:গ্রি:/লি: (Figure-1b)। অন্যদিকে BOD এর পরিমান শুষ্ক মৌসুমে বেশি থাকে (সর্বোচ্চ ৫০.২০ মি:গ্রা:/লি:) এবং বর্ষা মৌসুমে BOD এর পরিমান কমতে থাকে (সর্বোনিম্ন BOD ২.৬ মি:গ্রা:/লি:) (Figure-1c)। BOD এর জন্য EQS ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে (মৎস চাষে ব্যবহারে গ্রহণযোগ্য পানির মান)। বুড়িগঙ্গার পানির COD এর পরিমান ১০ মি:গ্রি:/লি: থেকে ২১২.৬২ মি:গ্রি:/লি: (Figure-1d) ছিল (শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মান ২০০ মি:গ্রা:/লি:)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS এর পরিমান (সর্বোনিম্ন ২৬.২ মি:গ্রা:/লি: এবং সর্বোচ্চ ৫৮৬ মি:গ্রা:/লি:)। সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল (Figure-1e) (শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মাত্রা/EQS ২১০০ মি:গ্রা:/লি:)। পানিতে Chloride এর পরিমান ৫.৯৮ মি:গ্রা:/লি: থেকে ৫৬.৯৮ মি:গ্রা:/লি: (Figure-1f) এবং শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (EQS) ১৫০-৬০০ মি:গ্রা:/লি:। Turbidity এর পরিমান (সর্বোনিম্ন ৩.৬ মি:গ্রা:/লি: ও সর্বোচ্চ ১২০ মি:গ্রা:/লি:) সারা বছর জুড়ে EQS অপেক্ষা বেশী ছিল (Figure-1g) (শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা/EQS ১০ এনটিইউ)। N.Bঃ EQS-Environmental Quality Standard

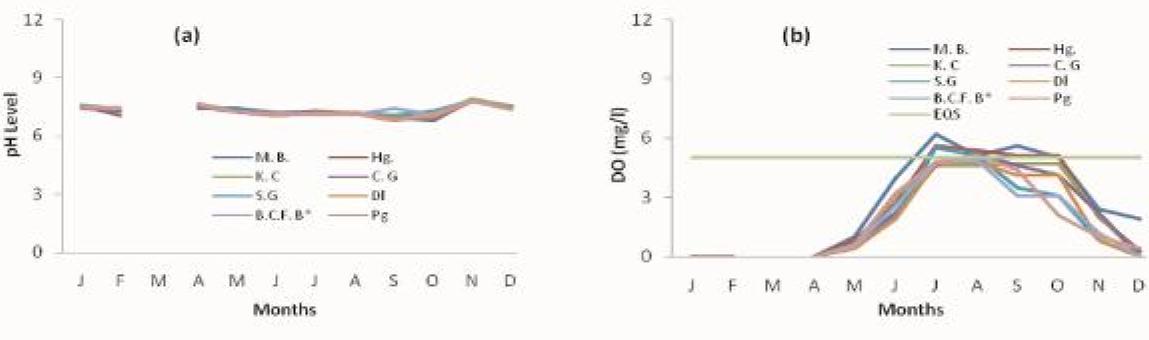

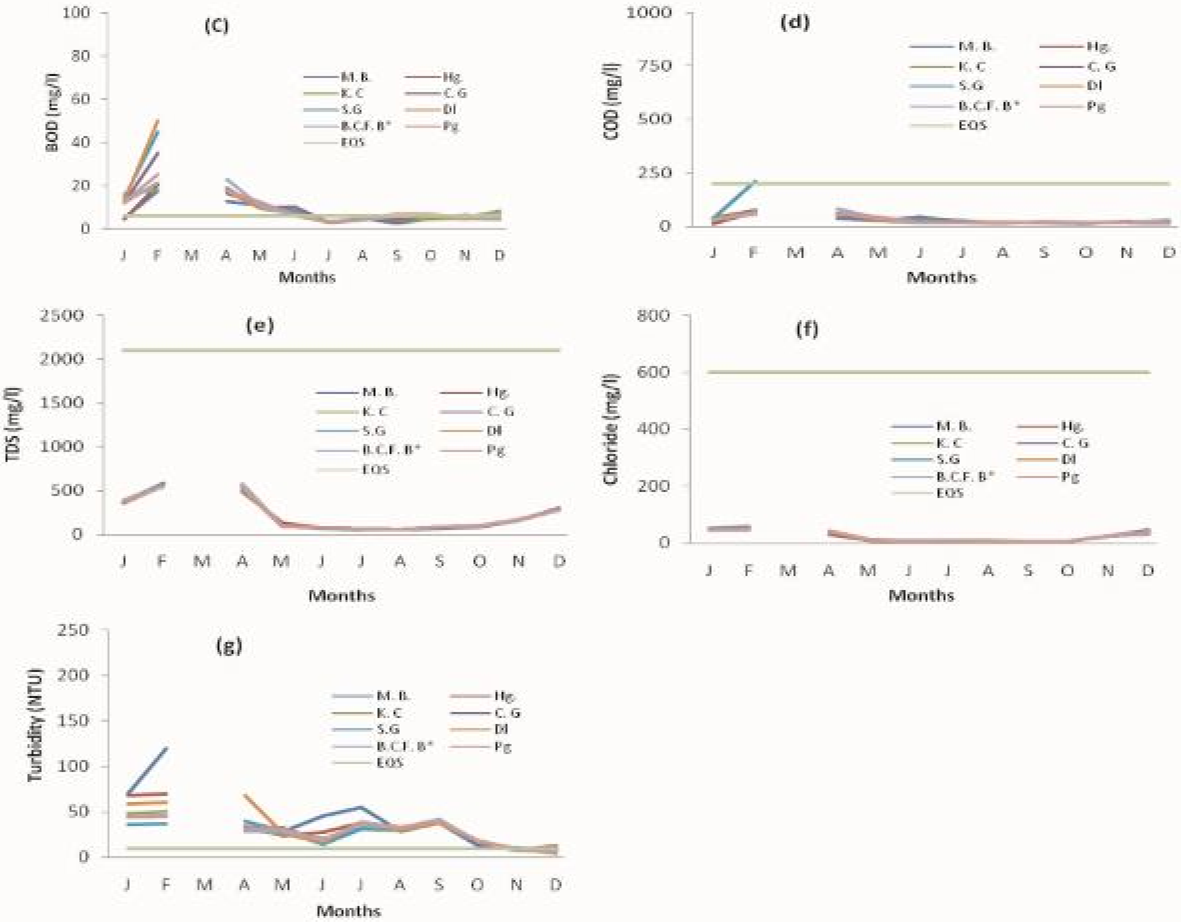

Fig. 20 : Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS, Chloride, Turbidity of Buriganga River in 2016

২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শীতলক্ষ্যা নদীর পানির pH ৬.৬৬-৭.৯৮ (Figure-2a) এবং EQS বা মৎস চাষে ব্যবহারে গ্রহণযোগ্য পানির pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO এর পরিমান EQS অপেক্ষা কম ছিল কিন্তু বর্ষা মৌসুমে DO এর পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বাধিক DO ছিল ১২ মি:গ্রা:/লি: (Figure-2b)। অন্যদিকে BOD এর পরিমান শুষ্ক মৌসুমে বেশী থাকে (সর্বোচ্চ ৩৮ মি:গ্রা:/লি:) এবং বর্ষা মৌসুমে BOD এর পরিমান কমতে থাকে (সর্বোনিম্ন BOD ০.৮ মি:গ্রা:/লি:) (Figure-2c)। BOD এর জন্য EQS ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে (মৎস চাষে ব্যবহারে গ্রহণযোগ্য পানির মান)। শীতলক্ষ্যার পানির COD এর পরিমান ১০ মি:গ্রা:/লি: থেকে ৯৪ মি:গ্রি:/লি: (Figure-2d) ছিল (শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মান ২০০ মি:গ্রা:/লি:)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS এর পরিমান (সর্বোনিম্ন ১০৭.৯০ মি:গ্রা:/লি: এবং সর্বোচ্চ ৪৯৮মি:গ্রা:/লি:) কিছুটা বেশী থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল (Figure-2e) (শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মাত্রা/EQS ২১০০ মি:গ্রা:/লি:)। পানিতে Chloride এর পরিমান ৪.০ মি:গ্রা:/লি: থেকে ৪৮.৯০ মি:গ্রা:/লি: (Figure-2f) এবং শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (EQS) ১৫০-৬০০ মি:গ্রা:/লি:।

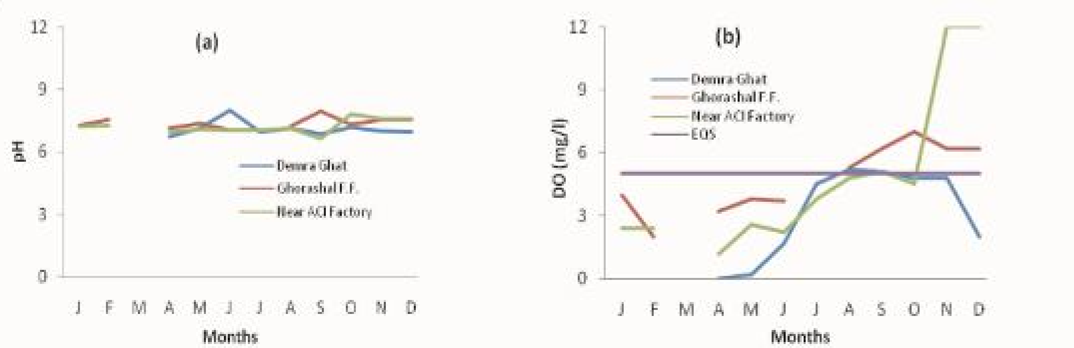

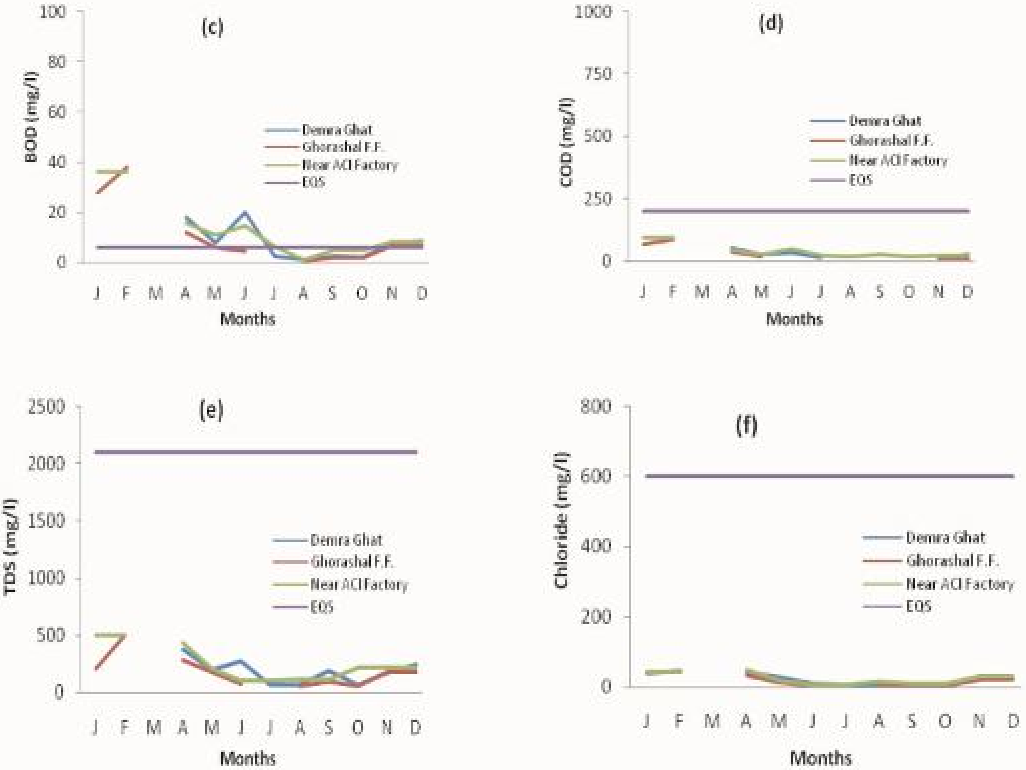

Fig. 21 : Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Shitalakhya River in 2016

২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তুরাগ নদীতে pH ৬.৬৮-৮.১১ (Figure-3a) ছিল। EQS বা মৎস চাষে ব্যবহারে গ্রহণযোগ্য পানির pH মান ৬.৫-৮.৫। তুরাগ নদীর পানিতে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্য ছিল। সর্বাধিক DO ৬.১ মি:গ্রা:/লি: (Figure-3b)। অন্যদিকে BOD এর পরিমান শুষ্ক মৌসুমে বেশী ছিল (সর্বোচ্চ ৭০.৩০ মি:গ্রা:/লি:) এবং বর্ষা মৌসুমে BOD এর পরিমান কমতে থাকে (সর্বোনিম্ন BOD ১.৮ মি:গ্রা:/লি:) (Figure-3c)। BOD এর জন্য EQS ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে (মৎস চাষে ব্যবহারে গ্রহণযোগ্য পানির মান)। তুরাগ নদীর পানির COD এর পরিমান ১০ মি:গ্রা:/লি: থেকে ২৫৮.০১ মি:গ্রি:/লি: (Figure-3d) ছিল (শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মান ২০০ মি:গ্রা:/লি:)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS এর পরিমান (সর্বোনিম্ন ৫৬ মি:গ্রা:/লি: এবং সর্বোচ্চ ৯৩০ মি:গ্রা:/লি:) কিছুটা বেশী থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল (Figure-3e) (EQS ২১০০ মি:গ্রা:/লি:)। তুরাগের পানিতে Chloride এর পরিমান ৬.০ মি:গ্রা:/লি: থেকে ১১৯.৭০ মি:গ্রা:/লি: (Figure-3f) এবং শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (EQS) ১৫০-৬০০ মি:গ্রা:/লি:। অর্থাৎ সারা বছর পানিতে Chloride-এর পরিমান উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে ছিল ।

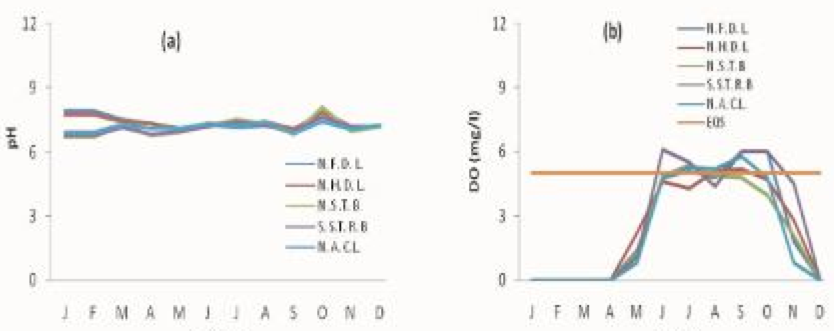

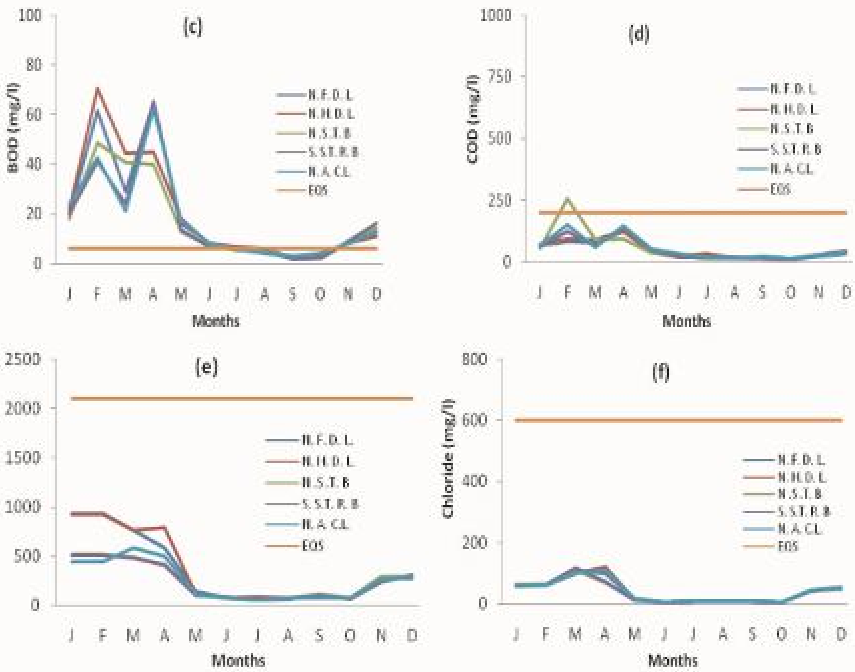

Fig. 22 : Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Turag River in 2016

গুলশান লেকের পানির গুনগত মান

Table 9 : pH of Gulshan Lake Water in 2016

Location of Gulshan Lake	Jan	Feb	Mar	Apl	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Near United Hospital Kalachadpur	7.1	7.2	7.2	6.89	7.31	7.26	7.26	7.28	7.31	7.72	7.21	7.02
Near Housing, South Bridge	7.11	7.3	7.3	7.11	6.93	7.21	7.26	7.22	7.18	7.62	7.38	7.25
Near Lake View Clinic	7.23	7.3	7.4	7.14	7.25	7.44	7.26	7.44	7.13	7.68	7.68	7.24
North Side Gulshan Baridhara Lake	7.42	7.7	7.8	7.23	8.22	7.38	7.38	7.61	7.14	7.59	7.11	7.26
Taltola Shooting Complex, South Side	7.49	7.5	7.5	7.43	7.58	7.4	7.4	7.81	7.08	7.52	7.67	7.69
North Side of Gulshan-1, Gudara Ghat	7.37	7.2	7.3	7.11	7.29	7.16	7.16	7.42	6.88	7.465	7.59	7.35
South Side of Gulshan-1, Gudara Ghat	7.68	7.4	7.4	7.18	7.35	7.23	7.23	7.68	7.11	7.4	7.48	7.32
Gulshan-Bonani Connection Bridge	7.71	7.2	7.2	7.21	**8.27**	7.28	7.28	7.61	7.45	7.26	7.12	7.07
Bonani Bridge	7.66	7.2		7.23	7.52	7.2	7.2	7.66	7.11	7.42	7.21	**6.85**
	6.5-8.5											

pH (সর্বোনিম্ন ৬.৮৫ ও সর্বোচ্চ ৮.২৭) সারা বছর গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে ছিল।

Table 10 : DO (mg/l) of Gulshan Lake Water in 2016

Location of Gulshan Lake	Jan	Feb	Mar	Apl	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Near United Hospital Kalachadpur	9.8	4.1	2.4	11.8	2.9	5.1	1.2	6.8	1.8	10.8	1.2	5
Near Housing, South Bridge	7.8	10.8	14.8	5.6	3.3	5.1	0.4	5.8	0.8	8.2	2.1	10
Near Lake View Clinic	10.8	7.8	8.3	10.6	7.7	5.1	1	8.2	1.8	7.6	7.2	7.1
North Side Gulshan Baridhara Lake	4.9	8.8	9.4	9.4	**15.3**	5.1	2.9	7.9	2.7	2.9	6.5	6.9
Taltola Shooting Complex, South Side	4.8	10.2	11.4	5.6	7.4	10.9	4.7	0.8	4.8	2.4	0.8	8
North Side of Gulshan-1, Gudara Ghat	5.9	8.2	8.6	4.8	2.1	10	0.8	1.2	2.8	0.6	1.2	4.7
South Side of Gulshan-1, Gudara Ghat	5.8	7.8	8	4	1.9	10	0.6	1.4	1.6	0.1	0	4
Gulshan-Bonani Connection Bridge	12.8	4.1	2.3	6.2	14.6	0.3	1.3	3.2	1.8	0.7	0	0.8
Bonani Bridge	7.8	5.6		2.1	6.9	1	0.7	6.2	1.7	2.2	2	1.7
EQS	5≥											

গুলশান লেকের পানির DO (সর্বোনিম্ন শুন্য) এবং (সর্বোচ্চ ১৫.৩ মি:গ্রা:/লি:)-এর পরিমান ব্যাপক মাত্রায় পরিবর্তনশীল। DO এর পরিমান ৫ মি:গ্রা:/লি: এর কম হলে লেকের স্বাস্থের জন্য তা ভাল নয় এবং শুন্য হলে উক্ত পানিতে জলজ প্রাণী বাঁচতে পারে না।

Table 11 : BOD (mg/l) of Gulshan Lake Water in 2016

Location of Gulshan Lake	Jan	Feb	Mar	Apl	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Near United Hospital Kalachadpur	18.4	12.2	12.1	24	18.4	24.2	18.2	18.1	18.8	25.4	22.4	13
Near Housing, South Bridge	24.2	16.4	12.2	28	30.8	20.8	18.6	16.2	17.7	21.8	24.2	16
Near Lake View Clinic	20.4	18.2	16.8	24	22.4	21.8	15.8	15.8	21.8	20.8	32	15
North Side Gulshan Baridhara Lake	14	22.6	14.3	28	20.8	33.8	13.5	16.2	16.6	22.9	24.2	15
Taltola Shooting Complex, South Side	12	16.8	18.2	24	20.6	17.4	12.6	18.1	18.2	12.2	20.8	10
North Side of Gulshan-1, Gudara Ghat	8.4	20.4	17.1	28	20.8	17.2	18.2	16.2	18.4	30.1	24	18
South Side of Gulshan-1, Gudara Ghat	18.4	18.6	18.8	24	22	20.4	15.4	18.1	22	**51.7**	28.2	13
Gulshan-Bonani Connection Bridge	**8.1**	22.8	18.3	18	16.6	17.6	11.2	18.1	42	20.4	20.4	14
Bonani Bridge	20.6	18.4	-	26	19.8	19	11.6	16	15	20.2	18.6	21
EQS	≤6											

বর্ণিত লেকের পানিতে সারা বছর **BOD** (সর্বোনিম্ন ৮.১ মি:গ্রা:/লি: ও সর্বোচ্চ ৫১.৭ মি:গ্রা:/লি:)-এর পরিমান গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার (EQS) তুলনায় অনেক বেশী। এটি নির্দেশ করে যে, গুলশান লেক দূষনের শিকার এবং লেক দূষনমুক্ত করার জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মেঘনা নদী হতে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ

ঢাকা শহর এবং এর চারপাশে প্রায় ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ঢাকা পানি সরবরাহ এবং পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন অথরিটি (DWASA) সুপেয় পানি সরবরাহ করে থাকে। এ পানি সরবরাহের পুরোটাই ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল। ফলে এটি প্রমাণিত যে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সংগ্রহ করে সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ঢাকা শহরের চারপাশে স্থিত নদী যথাঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু এবং তুরাগ নদীর ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত মানে দূষণমাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এটা পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে DWASA ঢাকা শহর হতে ৩০ (ত্রিশ) কিলোমিটার দুরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এবং আড়াইহাজার উপজেলার হারিয়া এবং বিশনন্দী নামক স্থান হতে মেঘনা নদীর পানি উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মেঘনা নদীর পানিকে দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্ট্রেন্দেনিং মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট ইন দি মেঘনা রিভার ফর ঢাকা'স সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং ঢাকা ওয়াসা উক্ত প্রকল্পের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

মোট প্রকল্প ব্যয়: ১১৬১.৩০ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন কাইন্ড ৩৮৭.১০ লক্ষ টাকা এবং প্রজেক্ট এইড ৭৭৪.২০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭।

প্রকল্পটির অর্থায়নকারী সংস্থা: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দ্বারা নিম্নবর্ণিত ০৪টি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের আশা করা হচ্ছে

- মেঘনা নদীর সংশ্লিষ্ট মোহনায় পানি দূষণজনিত জিআইএস ডাটা ভিত্তিক মানচিত্র তৈরী এবং ভবিষ্যতে নতুন ডাটা অন্তর্ভুক্ত করে ঐ মানচিত্র হালনাগাদকরণ, যা ঢাকা ওয়াসাকে পানি শোধন ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;
- মেঘনা নদীর সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি দূষক চিহ্নিত করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান করত পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সফল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আর্থিক প্রণোদনা অথবা পুরস্কারের ব্যবস্থা;
- মেঘনা নদীর সংশ্লিষ্ট মোহনা প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় রূপান্তরিত হওয়ার কোন আশংকা আছে কিনা তাহার কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রয়োজনবোধে সংরক্ষণের নিমিত্তে আইন ও নীতিমালাসহ প্রস্তাব পেশ এবং ঐ প্রস্তাব সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণকল্পে উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ঢাকা ওয়াসার পানি দূষণ নির্ণয়, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মেঘনা নদীর সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বাসিন্দাদের জলজ পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

চিত্র ১৫ : হারিয়া ও বিশনন্দী স্থানে মেঘনা নদীর বর্তমান চিত্র

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ইতোমধ্যে প্রকল্পটির আওতায় মেঘনা নদীর পানির গুনগত মান, প্রতিবেশগত জরীপ এবং দূষণ উৎসের মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেশগত জরিপ (Ecological Survey) দেখা যায় মেঘনা নদীর ইনটেক পয়েন্ট এলাকাটি জলজ এবং স্থলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ মাছ, অমেরুদণ্ডী জলজ প্রাণী, উভচর, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী, প্রজাপতি এবং নলখাগড়া ও জলজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ৫ ধরনের সংবেদনশীল আবাসভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে ৩টি বিশনন্দী ইনটেক পয়েন্টের কাছে এবং ২টি হারিয়া ইনটেক পয়েন্টের কাছে অবস্থিত। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সংগ্রহকৃত পানির নমুনা বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, মেঘনা নদীর পানির গুণগত মান যদিও সুপেয় পানির উপযোগী কিন্তু পানির গুণাগুন খারাপ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং পয়েন্টের ২০০১ সাল হতে ২০১২ সালের প্রাপ্ত পানি দূষণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়-প্রতি বৎসর দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমছে (৭.৫ মিগ্রা./লি. হতে ৬.০ মিগ্রা./লি.) এবং প্রলম্বিত দ্রবীভূত বস্তুকণা (TDS) শতকরা ১০ ভাগ হারে বেড়েছে। মাঠ সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ওয়াসা কর্তৃক নির্বাচিত পানি উত্তোলন স্থানের মেঘনা নদীর উভয় তীরে ১৫টি কারখানার বর্জ্য পানি সরাসরি মেঘনা নদীতে পতিত হচ্ছে। এর মাঝে হারিয়া ইনটেক পয়েন্টের ৫ কিলোমিটার ভাটিতে ১০টি কারখানা রয়েছে। মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে ৩০টি খাল এসে মিশেছে, এর মাঝে ৫টি খালের পানি মারাত্মকভাবে দূষিত। বিশনন্দী ইনটেক পয়েন্টের নিকটে উজানে বিশনন্দী খাল এবং এর কিছু উপরে হারিধোঁয়া খাল, আমিদার খাল এবং বোতারদার খাল হতে মারাত্মকভাবে দূষিত পানি মেঘনা নদীতে এসে মিশেছে। এ খালগুলোর উৎপত্তিস্থল উজানে রয়েছে শত শত ছোট ও মাঝারী আকারের শিল্পকারখানা। এসব কারখানা কোনরূপ পরিশোধন ছাড়াই তাদের তরলবর্জ্য নির্গমন করছে। বিশনন্দী খালের পানি বিশনন্দী ইনটেক পয়েন্টের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীতে জোয়ার-ভাটার কারণে দূষিত পানি ইনটেক পয়েন্ট পর্যন্ত পৌছতে পারে।

এছাড়া পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহের তালিকা ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। নদীর প্রাসঙ্গিক এলাকায় মোট ৮টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। নদীর পানির ওপর এসকল প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব রোধকল্পে সুনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। প্রকল্পের কারিগরি পরামর্শক দলের মতে, যদি এখনই টেকসই ও অগ্রিম নদী ব্যবস্থাপনা করা না হয়, তাহলে মেঘনা নদী থেকে নিরাপদ মাত্রার পানি সরবরাহ অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

চিত্র ১৬ : প্রকল্পের অধীন পানির গুণগতমান বিশ্লেষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

সুনামগঞ্জ জেলার আগাম বন্যাকবলিত টাঙ্গুয়ার হাওর ও মাটিয়ান হাওর এলাকায় পানিদূষণ মনিটরিং

পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকা গবেষণাগার ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত টিম কর্তৃক বন্যাকবলিত টাঙ্গুয়ার হাওর ও মাটিয়ান হাওর গত ২৪/০৪/২০১৭ ইং তারিখে পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে-

- পরিদর্শনকালে মাটিয়ান হাওয়ের পানির রং কিছুটা কালো দেখা যায়। পানি প্রবহমান ছিল এবং বাতাসে কিছুটা দুর্গন্ধ ছিল। টাঙ্গুয়ার হাওয়ের পানি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ছিল এবং বাতাসে কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায়নি।

- টাঙ্গুয়ার হাওয়ের পানি EC, Turbidity, TDS, SS, COD, NH_3 as N, Phosporous, Chloride নিম্নমাত্রায় রয়েছে যা মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- পানির কালো রং এবং নির্ধারিত মানমাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণ BOD (বিশেষত মাটিয়ান হাওরে) হাওয়ের পানি দূষণের জন্য দায়ী।
- হাওরের পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেলা বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন Dynamics অনুসারে পানির একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত বেলা বাড়ার সাথে সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে। অতঃপর দ্রবীভূত অক্সিজেন কমতে থাকে এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ আরও কমে যায়। রাতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্য হাওরে মাছের মৃত্যু ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সুপারিশমালা:

১. হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওরে আগাম বন্যার মূল কারণ উজান থেকে আসা ঢলের পানি। উজান থেকে আসা পানির গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করার জন্য একটি মনিটরিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।
২. হাওর এলাকার পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে জৈব কৃষির প্রচলন করতে হবে।
৩. হাওরের তলদেশ খনন করা, যাতে হাওরের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে হাওরের প্রান্তদেশের (perpheral zone) ফসলাদি ও গবাদিপশু রক্ষা পাবে।
৪. হাওর এলাকার পানি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা (বাঁধ, স্লুইস গেট ইত্যাদি) করতে হবে।
৫. হাওর অঞ্চলে পানি দূষণের কারণ অনুসন্ধান ও করণীয় নির্ধারণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

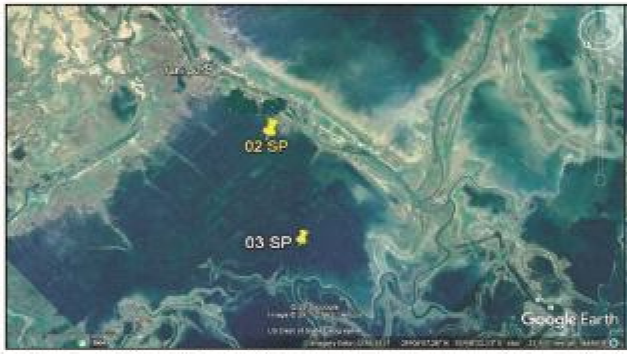

ছবি ১৭ : মাটিয়ান হাওরে পানির নমুনা সংগ্রহের স্থানসমূহ (গুগল ম্যাপে)

ছবি ১৮ : টাঙ্গুয়ার হাওরে পানির নমুনা সংগ্রহের স্থানসমূহ (গুগল ম্যাপে) Note: SP= Sampling Point

চিত্র ১৯ : হাওরের পানি পরীক্ষারত পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

সবার আগে প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন

গবেষণাগারে ব্যস্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

সপ্তম অধ্যায়

পরিবেশগত ছাড়পত্র

শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) জারি হওয়ার পর হতে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এই আইনের ২০ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (Environment Conservation Rules, 1997) জারি করে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১২(১) ধারা মোতাবেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মহাপরিচালকের নিকট হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। কোন শিল্প বা প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বিধি ৭-এ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ-কে নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে -

১. সবুজ
২. কমলা-ক
৩. কমলা-খ
৪. লাল

সকল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র, সাধারণ তথ্যাবলী, লোকেশন ম্যাপ, লে-আউট প্ল্যান, মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি এবং শিল্প প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। তবে মহানগর কার্যালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য ঐ মহানগর কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। এছাড়া, যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত, সে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ সরাসরি বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং একাধিক বিভাগে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি সদর দপ্তরে আবেদন গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

সবুজ শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত এবং বিদ্যমান সকল শিল্প ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। অপরদিকে, কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণীর প্রকল্প ও শিল্পের জন্য প্রথমে অবস্থানগত এবং পরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া, লাল শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে অবস্থানগত ও পরবর্তীতে ইআইএ অনুমোদন এবং সবশেষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল জেলা অফিস কর্তৃক সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন ও প্রদান করা হয়ে থাকে। বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। তবে, মহানগর কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সবুজ, কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন ও প্রদান করা হয়ে থাকে।

লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্রের অনুমোদন মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন ২০১০) এর ১২(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মহাপরিচালককে এ বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সদর দপ্তরে একটি কারিগরি কমিটি রয়েছে। কমিটি সময় সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের অঞ্চল, বিভাগ ও মহানগর কার্যালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত ছাড়পত্রের আবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ছাড়পত্রের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ পেশ করে। পরবর্তীতে মহাপরিচালকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সুপারিশমালা/সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা কার্যালয় হতে ছাড়পত্র প্রদানসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সদর দপ্তরের ন্যায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অঞ্চল, বিভাগ ও মহানগর কার্যালয়েও একটি করে কারিগরি কমিটি রয়েছে এবং উক্ত কমিটিসমূহ তাদের কার্যালয়ের অধিভুক্ত কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্র অনুমোদন এবং কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান/ছাড়পত্র নবায়ন করে থাকে।

চিত্র ২০ : মহাপরিচালক মহোদয়ের পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

২০১০ সালের জানুয়ারি হতে ২০১৭ জুন পর্যন্ত মোট ৪৬,৪৭৮টি নতুন প্রকল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং নতুন ও পুরাতন মিলে ৬০,৫০৭টি প্রকল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়।

টেবিল ১২ : ২০১০-২০১৭ (জুন) পর্যন্ত সারা দেশে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)	ছাড়পত্র প্রদান	ছাড়পত্র নবায়ন
২০১০	৪,৯৮৭	৫,২৯৮
২০১১	৫,৪৩৬	৭,৪৬৪
২০১২	৬,২৮২	৬,৬৪৭
২০১৩	৬,৯৯৮	৭,১২৩
২০১৪	৫,৮৬৭	৯,৩১৪
২০১৫	৬,২৬৪	৯,৯৯২
২০১৬	৭,০৮৩	৯,৫৭৭
২০১৭ (জুন পর্যন্ত)	৩,৫৬১	৫,০৯২
মোট =	৪৬,৪৭৮	৬০,৫০৭

২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সারা দেশে ইটিপি সংক্রান্ত তথ্যঃ

- ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা -১,৮৫৮টি।
- ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ইটিপি স্থাপিত মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৪২৫টি।
- ইটিপিবিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৩৩টি।

টেবিল ১৩ : বিভাগওয়ারি স্থাপিত ইটিপি ও ইটিপিবিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	জেলা/ বিভাগ/ অঞ্চল/ মহানগর	স্থাপিত ইটিপির সংখ্যা	ইটিপিবিহীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	ঢাকা অঞ্চল	১,০৩৪	২৮১	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
২	ঢাকা মহানগর	৬৪	৭৭	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
৩	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৭১	২১	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
৪	চট্টগ্রাম মহানগর	১০৮	১৭	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
৫	রাজশাহী বিভাগ	৩৮	১৭	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
৬	খুলনা বিভাগ	৫৮	১৭	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
৭	বরিশাল বিভাগ	৬	২	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
৮	সিলেট বিভাগ	১৭	১	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
৯	ময়মনসিংহ বিভাগ	২৯	০	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
	মোট	১,৪২৫টি	৪৩৩টি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের বছরভিত্তিক সংখ্যাঃ ২০১৪ হতে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২২০টি তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দেয়া হয়।

টেবিল ১৪ : জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা

সাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
২০১৪	২৫টি
২০১৫	৩৭টি
২০১৬	৮৫টি
২০১৭ (জুন পর্যন্ত)	৭৩টি
মোট =	২২০টি

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক প্রস্তাবিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার এবং ইজ অব ডুয়িং বিজনেস এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে ছাড়পত্র প্রদান সেবা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকুলে ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সময়সীমা আরো কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের অত্যন্ত সীমিত জনবল নিয়ে বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ক সেবা আও ত্বরান্বিত ও গনমুখী করার জন্য সময়াবদ্ধ প্রক্রিয়ায় ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

টেবিল ১৫ : শিল্প-প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা

শ্রেণী	ছাড়পত্রের ধরন	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-তে বর্ণিত সময়সীমা (কার্যদিবস)	পুনঃনির্ধারিত সময়সীমা (কার্যদিবস)
সবুজ	পরিবেশগত	১৫	৭
কমলা-ক	অবস্থানগত	৩০	১৫
	পরিবেশগত	১৫	৭
কমলা-খ	অবস্থানগত	৬০	২১
	পরিবেশগত	৩০	২০
লাল	অবস্থানগত	৬০	৪৫
	ইআইএ অনুমোদন	৬০	৩০
	পরিবেশগত	৩০	৩০

টেবিল ১৬ : শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ছাড়পত্র নবায়ন ফি

(পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১৩ অনুসারে)ঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকৃত অর্থ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি (টাকায়)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি
১	২	৩	৪
(ক)	০১ (এক) লক্ষ হতে ০৫ (পাঁচ) লক্ষের মধ্যে	১,৫০০	৩ নং কলাম-এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ
(খ)	০৫ (পাঁচ) লক্ষ হতে ১০ (দশ) লক্ষের মধ্যে	৩,০০০	- ঐ -
(গ)	১০ (দশ) লক্ষ হতে ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষের মধ্যে	৫,০০০	- ঐ -
(ঘ)	৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ হতে ০১ (এক) কোটির মধ্যে	১০,০০০	- ঐ -
(ঙ)	০১ (এক) কোটি হতে ০৫ (পাঁচ) কোটির মধ্যে	২০,০০০	- ঐ -
(চ)	০৫ (পাঁচ) কোটি হতে ২০ (বিশ) কোটির মধ্যে	৪০,০০০	- ঐ -
(ছ)	২০ (বিশ) কোটি হতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	৮০,০০০	- ঐ -
(জ)	৫০ (পঞ্চাশ) কোটি হতে ১০০(একশত) কোটির মধ্যে	১,২০,০০০	- ঐ -
(ঝ)	১০০ (একশত) কোটি হতে ২০০(দুইশত) কোটির মধ্যে	২,০০,০০০	- ঐ -
(ঞ)	২০০ (দুইশত) কোটি হতে ৫০০(পাঁচশত) কোটির মধ্যে	৩,০০,০০০	- ঐ -
(ট)	৫০০ (পাঁচশত) কোটি হতে ১০০০(এক হাজার) কোটির মধ্যে	৪,০০,০০০	- ঐ -
(ঠ)	১০০০ (এক হাজার) কোটির উর্ধ্বে	৫,০০,০০০	- ঐ -

- মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কোড নং ১-৪৫৪১-০০০০-২৬৮১ তে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হয়।
- শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ছাড়পত্র ফি বা নবায়ন ফি-এর ওপর ১৫% ভ্যাট আলাদাভাবে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হয়।

সবার জন্য প্রয়োজন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

কক্সবাজার ইসিএতে নির্মিত পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

অষ্টম অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের ব্যবস্থাপনা

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের ব্যবস্থাপনা

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এ দেশে নগরায়ন, শিল্পায়নসহ মানুষের নানাবিধ প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের ফলে আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নানান ধরনের হুমকির সম্মুখীন। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়ে ১৮(ক) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন"। জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নানাবিধ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ প্রণয়ন

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ জারী করা হয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ থেকে তা কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের মোট ৫১টি ধারার মধ্যে ৪, ৬, ৭, ৩০, ৩৩, ৩৬ এবং ৪৮ ধারাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়নের কথা সরাসরি বলা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য বিধিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (NBSAP) ২০১৬-২০২১ প্রণয়ন

জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর সদস্য দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ২০১০ সালে সিবিডি Conference of Parties-এর দশম সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ৫টি Strategic Goal-এর আওতায় ২০টি টার্গেট নির্ধারণ (Biodiversity Strategic Planning 2011-2020) করা হয়, যেগুলোকে আইচি বায়োডাইভারসিটি টার্গেটস নামে অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০-এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান অভ্ বাংলাদেশ ২০১৬-২০২১ (NBSAP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area সংক্ষেপে ECA/ইসিএ) ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুসারে বিভিন্ন সময়ে এ-পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী পাহাড়ী এলাকার উৎপত্তিস্থল থেকে চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার কর্ণফুলী নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত ১০৭ কিলোমিটার হালদা নদী ও নদীর উভয়পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Country Map Showing the Positions of the ECAs

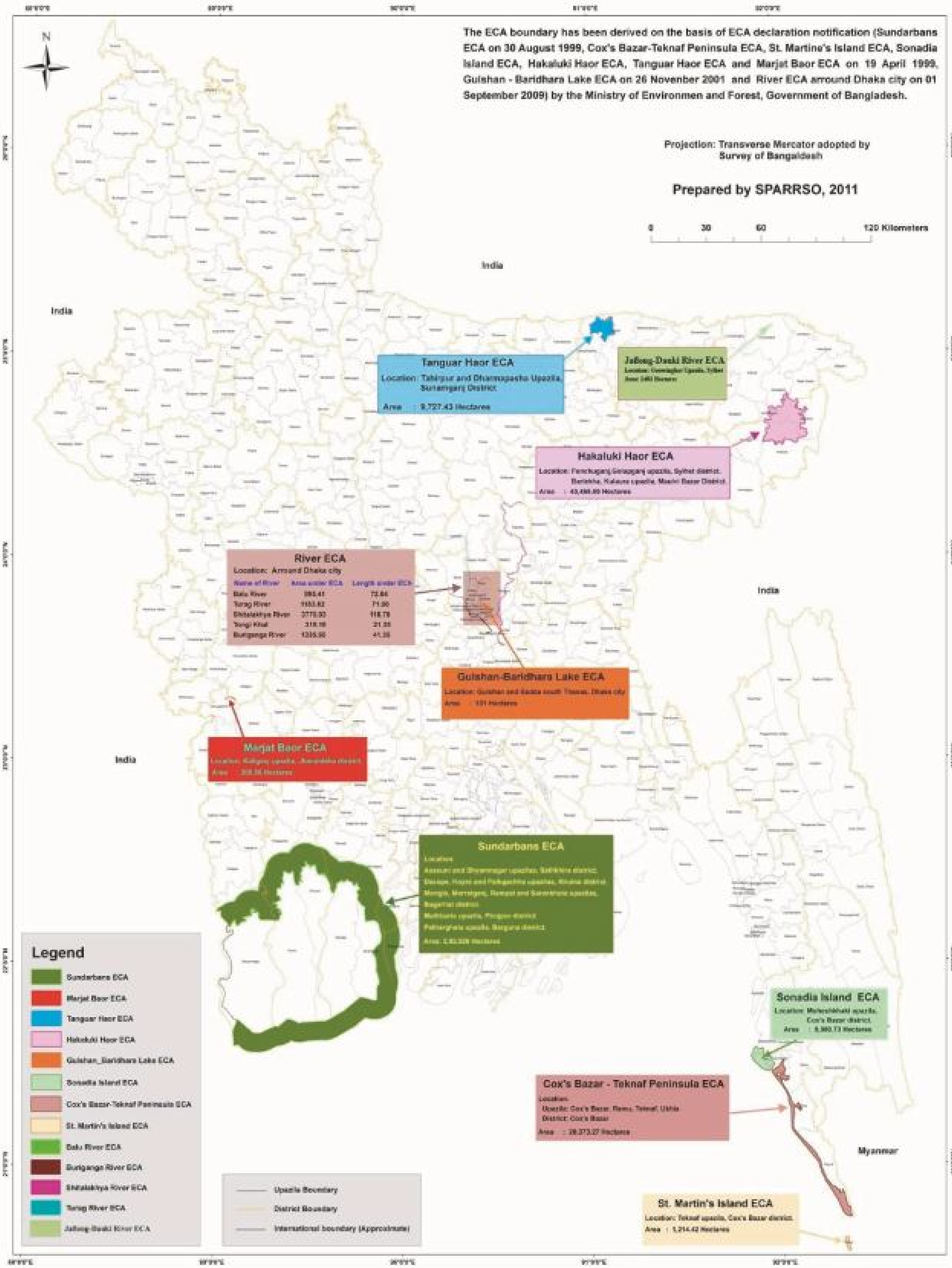

ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

কমিউনিটি বেইজ্‌ড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প)

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণ এবং অন্যান্য সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে ২০১০-২০১৫ সময়ে হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে কমিউনিটি বেইজ্‌ড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে ২০১৬-১৭ সময়ে স্ট্রেংদেনিং এন্ড কনসলিডেশন অব সিবিএ-ইসিএ (দ্বিতীয় পর্যায়) গৃহীত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

- সোনাদিয়া দ্বীপে গ্রাম সংরক্ষণ কেন্দ্র (Village Conservation Center, VCC) ভবন কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (Cyclone Shelter) নির্মাণ করা হয়েছে।
- হাকালুকি হাওরে ২টি সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।
- সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে গঠিত ৬৯টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG) এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে।
- বিদ্যমান সম্পদ/স্থাপনাসমূহ:
    ১. ২টি সৌর শক্তিচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।
    ২. ৫টি সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প করা হয়েছে।
    ৩. হাকালুকি হাওরে ১০টি সাবমার্জিবল বাঁধ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রোপিত গাছের চারা রোপণ।
    ৪. ১০টি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রতিটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে নির্মিত জীববৈচিত্র্য মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।
    ৫. ৪টি পরিবেশ টাওয়ার নামে পরিচিতি প্রাপ্ত ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে।
    ৬. হাকালুকি হাওরে প্রতিষ্ঠিত ১০টি জলাভূমির অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে।
    ৭. হাকালুকি হাওরে সৃজিত ১০ হেক্টর ও সংরক্ষিত ৫০০ হেক্টর জলজ বন সৃজন করা হয়েছে।
    ৮. গুরুত্বপূর্ণ পাখির আবাসস্থল এলাকা সংরক্ষণ করা হয়েছে।
    ৯. প্রায় ৪০০ একর আয়তনের ম্যানগ্রোভ বন সৃজন এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।
    ১০. গ্রাম সংরক্ষণ দলকে ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান (Micro Capital Grant, MCG), সরাসরি উপকরণ সহায়তা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প:

সেন্টমার্টিনের জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে **'প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ'** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি ২০১৬ হতে ২০২০সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চলছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

- একমাত্র কোরাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বীপের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এবং ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থার উন্নয়ন।

- সেন্টমার্টিন দ্বীপের কোরাল এবং ফ্লোরা ও ফনা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথ/উপযুক্ত সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বিনিময়।

ভূমির অবক্ষয় ও মরুময়তা প্রতিরোধ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে UNCCD কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। UNCCD-র সিদ্ধান্ত মোতাবেক আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক স্টেকহোল্ডার Consultation-এর মাধ্যমে Bangladesh National Action Program for Desertification, Land Degradation and Drought 2015-2024 প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

◆ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)-এর ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত COP12 এ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) -এর সাথে সমন্বয় করে ২০৩০ সালের মধ্যে Land Degradation Neutrality (LDN) অর্জনের নিমিত্তে target setting এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ উক্ত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করে UNCCD সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করে। বাংলাদেশের আগ্রহের প্রেক্ষিতে LDN অর্জনের জন্য Target Setting Programme (TSP) কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য Global Mechanism (GM) কর্তৃক অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এর ফলোআপ হিসেবে বাংলাদেশে LDN অর্জনের লক্ষ্যে National Target Setting এর জন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিগত এপ্রিল ২০১৭ তারিখে প্রারম্ভিক এবং ১৬-১৭ জুন Validation কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

◆ শস্য ভাণ্ডারখ্যাত রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় মরুকরণ রোধ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে আগস্ট ২০১৬ মাসে Discussion Meeting on Ground Water Depletion and Environmental Degradation in Barind Tract and way forward শীর্ষক একটি সভার আয়োজন করা হয়।

◆ বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ রোধ দিবস উদযাপন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ভূমির অবক্ষয়রোধ, মরুকরণ মোকাবেলার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিগত ১৭ জুন ২০১৭ উক্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

Figure 21 : World Day to Combat Desertification

National Biosafety Framework বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

National Biosafety Framework বাস্তবায়নে UNEP–GEF এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক Implementation of National Biosafety Framework of Bangladesh (INBF) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো: ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নপূর্বক বায়োসেফটি বিষয়ক সামর্থ্য অর্জন করা। এবং সার্বিক উদ্দেশ্য হলো: কার্টাগেনা প্রটোকল অন বায়োসেফটি- এর বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের লক্ষ্যে কার্যকর এবং গতিশীল ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবস্বাস্থ্য অটুট রাখা এবং এ লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য জোরদার করা। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত মূল কার্যক্রমসমূহ

- চারটি পরামর্শ-কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে Biosafety Policy and Monitoring and Enforcement Manual এর খসড়া প্রণয়নসহ Bangladesh Biosafety Rules Ges Biosafety Guidelines এর সংশোধন/পরিমার্জনের খসড়া তৈরী করা হয়েছে। এ সব কর্মশালায় সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।
- প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি জিএমও ডিটেকশন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যা বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।
- জিএমও ডিটেকশন ও Good Laboratory Pratices-এর উপর ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাব সংশ্লিষ্ট ১০জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- Biosafety Regulatory System and Network Development-এর উপর বিভাগীয় পর্যায়ে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে ২টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ২০০জন বিজ্ঞানী, গবেষক বা কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
- প্রকল্পের আওতায় বায়োসেফটি বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন ও বায়োসেফটি রেগুলেটরী সিস্টেমের উপর অভিজ্ঞতা Aর্জনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় ১০ জন কর্মকর্তা এবং Philippines, Malaysia and Singapore-এ ৫ জনকর্মকর্তার অংশগ্রহণে ২টি শিক্ষা সফর সম্পন্ন হয়েছে।
- ভারতের পাঞ্জাব বায়োটেকনোলজি ইনকিউবেটরে জিএমও ডিটেকশন এন্ড গুড ল্যাবরেটরী প্রাকটিস শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এতে ০৭ জন ল্যাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

চিত্র ২২ : প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ স্থাপিত জিএমও ডিটেকশন ল্যাব উদ্বোধন করছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি ও মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব

নবম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি

প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি

মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে পৃথিবী, সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নতুন নতুন পরিবেশগত সমস্যা। নিত্যনতুন এ সকল পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলাপূর্বক ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ অর্জনের পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক প্রতিনিয়ত ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে সরকারকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। পরিবেশগত সকল সমস্যা মোকাবেলাপূর্বক সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এ খাতে পর্যাপ্ত দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সময়ের দাবি। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করাও প্রয়োজন। এজন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধিত (২০১০) এবং পরিবেশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও ইহার আওতায় জারিকৃত বিভিন্ন বিধিমালার আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর ব্যাপক দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। পরিবেশ অধিদপ্তর এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণ ও অংশীজনের সচেতন করার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ব্যাপক দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অধিদপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এ খাতে কর্মরত জনশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেই। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উদ্ভূত পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় পর্যাপ্ত সক্ষমতা সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে।

স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট না থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের লেখচিত্র নিম্নরূপ:

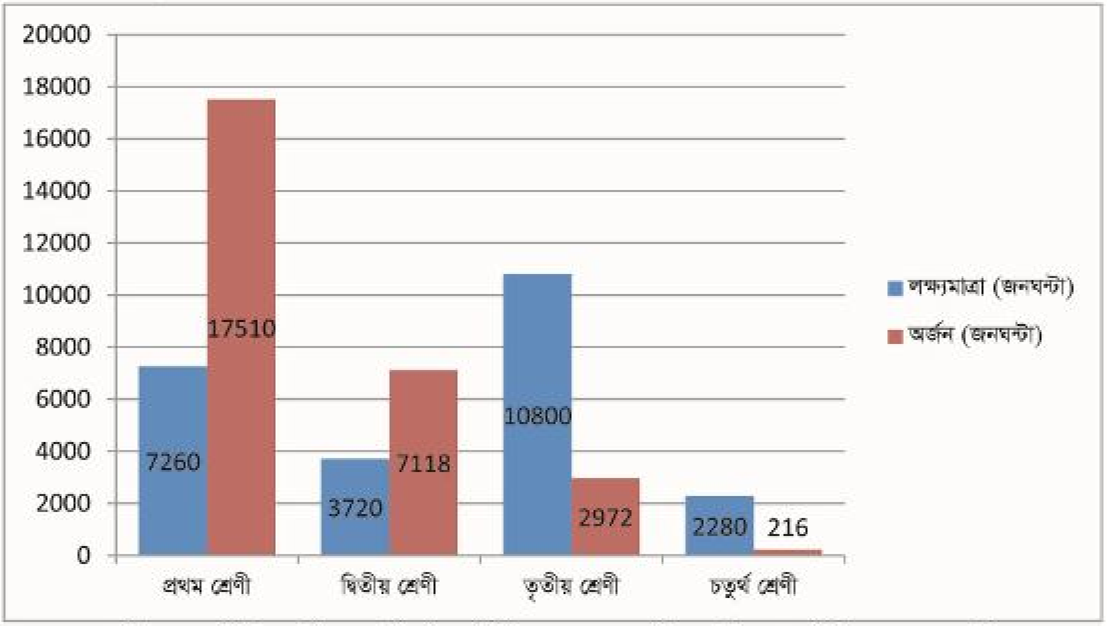

লেখচিত্র ২৩ : বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তুলনামূলক চিত্র

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার কম। প্রধান কারণ হলো চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয় আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যম যেখানে কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব মূলত কর্মচারী সরবরাহ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের। অপর দিকে দেশে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার স্বল্পতা ও সুযোগ কম থাকায় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীগণের সংখ্যা কম। প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ, সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও এসিডিফিকেশন মনিটরিং, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের পাশাপাশি নবাগত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ২৩ : পঞ্চম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

পঞ্চম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে প্রশিক্ষণার্থী নবাগত কর্মকর্তাগণ তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বায়ুদূষণকারী ইটভাটা, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত কম্পোস্ট প্ল্যান্ট এবং পরিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা পরিদর্শন করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

চিত্র ২৪ : ইলেকট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জনসাধারণকে প্রদানকৃত সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী চিন্তা ধারণা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক অভিনব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক দাপ্তরিক কাজে প্রবর্তিত ইলেকট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনা ও ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ২৫ : পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রতিবেদনাধীন সময়ে একাউনটেন্ট, নমুনা সংগ্রহকারী, গাড়ি চালক, অফিস সহকারী, গবেষণাগার সহকারী, অফিস সহায়কসহ সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব উদ্যোগে খাতভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা বা প্রকল্প কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বেসরকারি দপ্তর থেকে শিক্ষা সফরে আগত প্রতিনিধিদের পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের ওপর ব্রিফ করা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ গ্রহণের মাধ্যমেও পরিবেশ সংরক্ষণে দেশে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

টেবিল ১৭ : পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২০১৬-২০১৭ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ/কর্মসূচির নাম	আয়োজনের সময়	যাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	গবেষণাগার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার	০৬ অক্টোবর ২০১৬	৯ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	২৭
২.	মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা	১৩-১৯ অক্টোবর ২০১৬	১৬-১১তম গ্রেডের নবীন কর্মচারী	৩০
৩.	পঞ্চম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা মডিউল	১৬ অক্টোবর হতে ১৫ নভেম্বর ২০১৬	১০ম-৯ম গ্রেডের নবীন কর্মকর্তা	২৮
৪.	"ই-ফাইল (ইলেকট্রনিক নথি) ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৮ নভেম্বর	৬ষ্ঠ ও তদোর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা	৪২
		৪-৬ ডিসেম্বর ২০১৬	৮ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা কর্মচারী	১৯
		১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬	৭ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা কর্মচারী	১৮
		১৭-২০ ডিসেম্বর ২০১৬	৮ম-১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা কর্মচারী	১৯
৫.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২২ ডিসেম্বর ২০১৬	১০ম-৭ম গ্রেডের কর্মকর্তা	২৭
৬.	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ	১৫-১৯ জানুয়ারি ২০১৭	১০ম-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা	২৪
		২২-২৬ জানুয়ারি ২০১৭	১০ম-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা	২৫
৭.	ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩১ মার্চ-১ এপ্রিল ও ৭ -৮ এপ্রিল ২০১৭	৯ম ও তদোর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা	২৬
৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২০ এপ্রিল ২০১৭	৯ম ও তদোর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা	৫৪
৯.	সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও এসিডিফিকেশন মনিটরিং	১৬-১৮ মে ২০১৭	১০ম-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা	২০
১০.		১৩-১৫ জুন ২০১৭	সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯ জন কর্মকর্তা

টেবিল ১৮ : ২০১৬-২০১৭ সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	আয়োজক সংস্থা	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১.	Short Lived Climate Pollutants National Planning and the Long range Energy Alternatives Planning System-Integrated Benefits Calculator	SLCP প্রকল্প, পরিবেশ অধিদপ্তর	১০ম-৯ম গ্রেডের ৫ জন কর্মকর্তা
২.	Building Capacity for the use of Researce Evidence (BCURE)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২০ জন কর্মকর্তা
৩.	ই-ফাইলিং বিষয়ক TOT (Training of Trainers) প্রোগ্রাম	এটুআই	৩ জন কর্মকর্তা
৪.	Training on Sludge Management	GIZ	১৬ জন কর্মকর্তা
৫.	Result-based Monitoring System -এর ওপর কর্মশালা	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪ জন কর্মকর্তা
৬.	Training on "Environmental and Social Impact Assessment"	FAO	৬ জন কর্মকর্তা
৭.	Training Environmental Inspectioon System	GIZ	২২ জন কর্মকর্তা
৮.	Climate Change Negotiation Science and Politics	FAO	৩ জন কর্মকর্তা
৯.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১০ জন কর্তকর্তা
১০.	ই-টেন্ডারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০৫ জন কর্মকর্তা
১১.	Operation Planning Workshop of Component. Improving Public Financial Management.	CFG Project	১৩ জন কর্মকর্তা
১২.	পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঢাকা গবেষণাগার,পরিবেশ অধিদপ্তর	৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী
১৩.	উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ডিজাইন	a2i প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪ জন কর্মকর্তা
১৪.	Wastewater Sampling	GIZ	২০ জন কর্মকর্তা
১৫.	ETP Inspection	GIZ	২৬ জন কর্মকর্তা
১৬.	Capacity Building of DoE Officials on the Protection of Ozone Layer	ওজোন সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর	৩০ জন কর্মকর্তা
১৭.	রিও কনভেনশনসমূহের ওপর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১০ জন কর্মকর্তা

টেবিল ১৯ : মানবসম্পদ উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

মানবসম্পদ কর্মসূচির প্রকৃতি	কর্মসূচির পরিমাণ/সংখ্যা
পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	১২৮৪০ জনঘন্টা
পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৩৩২০ জনঘন্টা
দেশীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৬০৬৪ জনঘন্টা
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও কনফারেন্স	৫৫৯২ জনঘন্টা
মোট কর্মসূচি	২৭৮১৬ জনঘন্টা
জনপ্রতি গড়	৬৯.৪৮ জনঘন্টা

লেখচিত্র ২৪ : ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের অবস্থান চিত্র

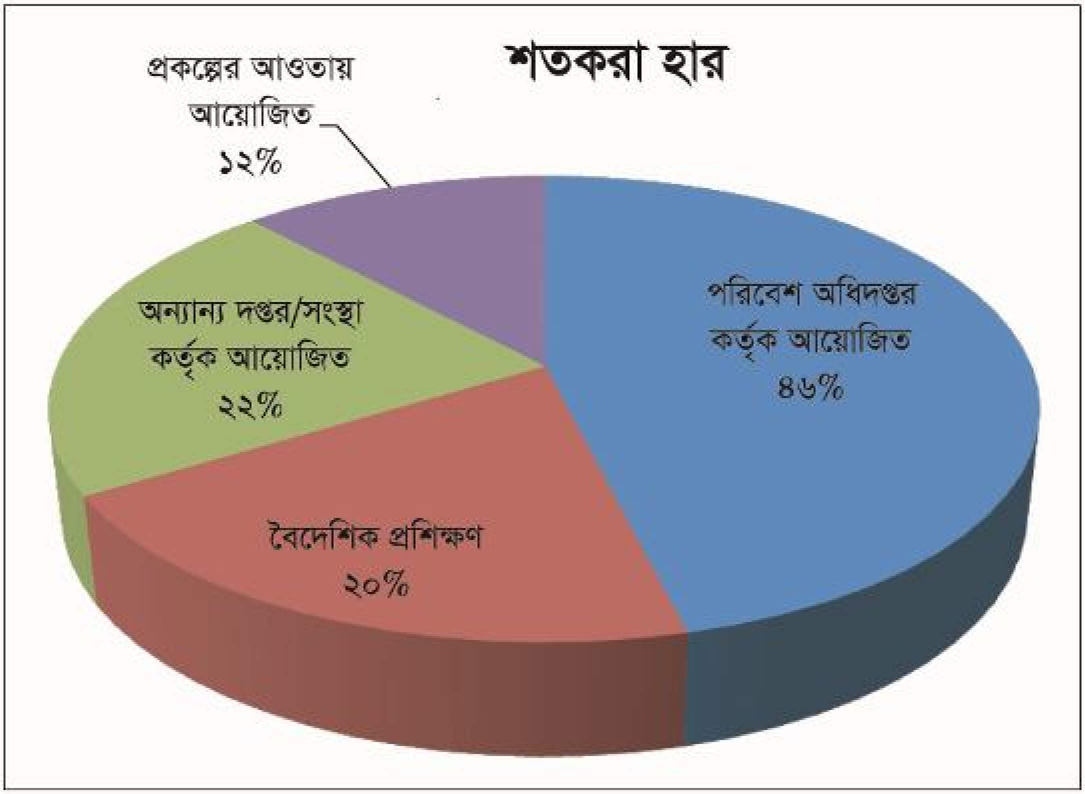

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন

বর্তমান গতিশীল বিশ্বে একটি দক্ষ, আধুনিক ও সেবামূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন কাজে গতিশীলতা আসে, তেমনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা যায়। তাই সরকার সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিবেশ অধিদপ্তর ধারাবাহিকভাবে নিজ অধিক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমকে অধিকতর গ্রাহকসেবামুখী করার লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যার মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ার অটোমেশনসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান; নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি ও এর উন্নয়ন; এনফোর্সমেন্ট, রিট মামলা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি এবং ইমেইল সেবা প্রধানসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়েও পরিবেশ অধিদপ্তর তার বিদ্যমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নিত্যনতুন সুবিধা সংযোজন করেছে। এ সময়ে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

ইজিপি বাস্তবায়ন

চিত্র ২৬ : পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ইজিপি কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন

সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করার লক্ষ্যে সরকার ইজিপি (ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) পদ্ধতির প্রচলন করেছে। ইজিপি পদ্ধতি প্রচলনের ফলে ক্রয় প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, অপরদিকে টেন্ডারবাজির দৌরাত্ম্যও হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ হতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের ক্রয় কার্যে ইজিপি পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে ইজিপি পদ্ধতি চালু করার পর হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৫১,২৬,৩৯৭/- টাকা মূল্যের ৩টি টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

ই-ফাইল (ইলেকট্রনিক নথি) ব্যবস্থাপনা

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিগত ১০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ হতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। ই-ফাইল ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদর দপ্তরে ৩ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করাসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ই-ফাইলিং সিস্টেমের মাধ্যমে ২১৩টি ডাক এবং ২২৮টি নোট প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ই-ফাইলিং কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ চিত্র-২২-এ প্রদান করা হলো।

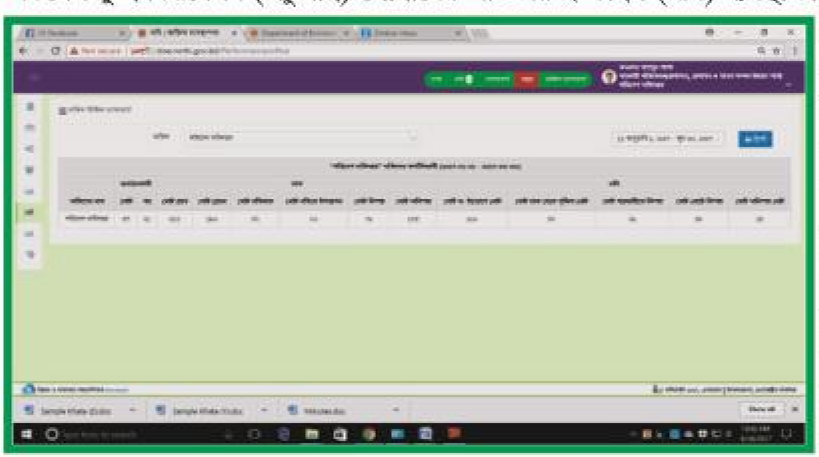

চিত্র ২৭ : পরিবেশ অধিদপ্তরের ইফাইলিং ব্যবস্থার ফ্রন্ট পেইজ

ছাড়পত্র অটোমেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি

নাগারিক সেবা সহজীকরণসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিগত ৮ এপ্রিল ২০১৫ হতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ার অনলাইন প্রক্রিয়া বা অটোমেশন পদ্ধতি চালু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় অনলাইনে ছাড়পত্রের আবেদন দাখিলসহ ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি ধাপ উদ্যোক্তা কর্তৃক মনিটরিং সুবিধা চালু করা হয়। ফলে বর্তমানে উদ্যোক্তা তাঁর নিজ কার্যালয় থেকে ছাড়পত্রের আবেদন দাখিল করতে পারেন এবং তা অনলাইন মনিটর করতে পারেন। ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে বর্তমানে অনলাইন ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে আরো জনবান্ধব সেবায় পরিণত করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পরিবেশগত ছাড়পত্রটিকেও ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা খুব শিগগির অটোমেশন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে। চালু হওয়ার পর থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩৬,৮৯৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৪,৪১১টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল ২০ : অনলাইনে ছাড়পত্র নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্য (হালনাগাদ করতে হবে)

প্রকল্পের ধর	প্রাপ্ত আবেদন	ছাড়পত্র প্রদান/ নবায়ন	প্রক্রিয়াধীন	আবেদন খারিজ
সবুজ	৪১১	২২৪	১৬৭	২০
কমলা (ক)	৯,৬৯৪	৭,১৬২	২,২৫২	২৮০
কমলা (খ)	২১,৯১৪	১৩,৩১৭	৭,৮১৩	৭৮০
লাল	৪,৮৭৭	২,৪৪৯	২,২৫৩	১৭৫
	৩৬,৮৯৬	২৩,১৫২	১২,৪৮৫	১,২৫৫

এছাড়াও প্রতিবেদনাধীন সময়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে:

- ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের সকল আইন, বিধি, রিপোর্ট, গেজেট, নাগরিক সেবার তথ্য/উপাত্ত সংরক্ষিত রয়েছে। ওয়েবসাইটের তথ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাকে দপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরী করা হয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা ইমেইল ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।
- অধিদপ্তরের জন্য একটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে।
- এনফোর্সমেন্ট, রিট মামলা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এতে সহজেই রিপোর্ট জেনারেট করা সম্ভব হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে হাইস্পিড ইন্টারনেট সুবিধা লাভের জন্য ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে অপটিক্যাল সংযোগসহ পরিপূর্ণ ল্যান সেটআপের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে প্রতিটি কম্পিউটারই রিসোর্স শেয়ারিং এবং হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর সুবিধা লাভ করেছে।
- তথ্য ভান্ডার হিসেবে অধিদপ্তরের সার্ভারে নতুন সার্ভার (Network Attached Storage) সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে ল্যানভুক্ত সকল ইউজার Large Volume Data শেয়ার ও সংরক্ষণ করতে পারছে।

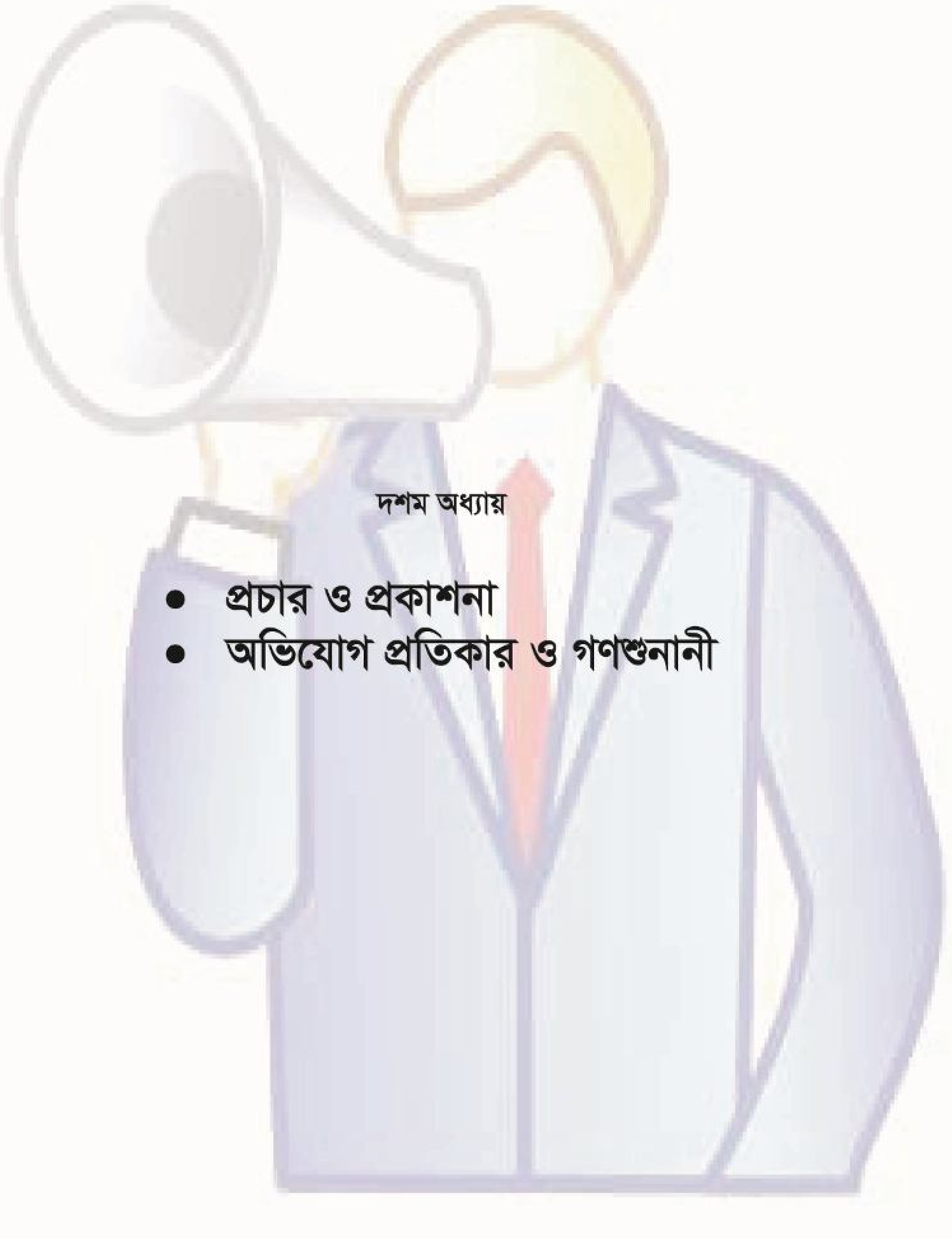

দশম অধ্যায়

- প্রচার ও প্রকাশনা
- অভিযোগ প্রতিকার ও গণশুনানী

পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম

পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নির্ধারিত প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া বিশ্ব জলাভূমি দিবস, আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস, বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং জাতীয় পাবলিক সার্ভিস ডেসহ পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য দিবসও উদ্‌যাপন করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

জাতীয় পর্যায়ে ৫ জুন ২০১৭ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য : প্রাণের স্পন্দনে, প্রকৃতির বন্ধনে (Connecting People to Nature)। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক স্লোগান প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা এবং পরিবেশ মেলা আয়োজন, গাছের চারা বিতরণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুদে বার্তা প্রেরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার আয়োজন, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার, নির্বাচিত জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়া, প্রবন্ধ/কবিতা সম্বলিত সমৃদ্ধ সুদৃশ্য স্মরণিকা ও জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭-এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। জাতীয় কর্মসূচির আলোকে সকল জেলা/উপজেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

চিত্র ২৮ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চিত্র ২৯ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭-এর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

পরিবেশ মেলা আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে অধিদপ্তরের বিভাগীয়/জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পাঁচ দিনব্যাপী পরিবেশ মেলা উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে উদ্যোক্তাগণক উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিবছর পরিবেশ মেলার আয়োজন করে। দেশি-বিদেশি ৭৪টি প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সালের পরিবেশ মেলায় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশবান্ধব পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করে।

চিত্র ৩০ : পরিবেশ মেলা ২০১৭-এর স্টল পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান

উন্নত পরিবেশ সুস্থ জীবনের পূর্বশর্ত। আধুনিকায়ন, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। একইসাথে এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। পরিবেশের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ায় সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিবেশ রক্ষায় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত দুরূহ। দেশের প্রতিটি নাগরিককে তাঁর অবস্থান থেকে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে, সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করে। শুরুতে চারটি ক্যাটাগরি যথা: (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ, (খ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, (গ) পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং (ঘ) পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার- এ জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান এবং জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ পদক, সনদপত্র এবং ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে ২০১১ সালে জাতীয় পরিবেশ পদকের সম্মানী ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় উন্নীত করে জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা সংশোধিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ মে ২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ পদক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে পরিবেশ উন্নয়নে ব্যক্তিসাধারণের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৬ (৩+৩) টি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালের সংশোধিত জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২১ (একুশ) ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য ও আরো

৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (ব্যক্তিগত পর্যায়) ক্যাটাগরিতে ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল; পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়) ক্যাটাগরিতে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এবং পরিবেশ শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত পর্যায়) ক্যাটাগরিতে জনাব মোকারম হোসেন, ১৬৯ গ্রীন রোড, কলাবাগান, ঢাকাকে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়।

চিত্র ৩১ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে পরিবেশ পদক বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৬ষ্ঠ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক ২০১৭

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় পরিবেশ অধিদপ্তর এ বছরও "৬ষ্ঠ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৭" আয়োজন করেছে। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দেশের খ্যাতিমান ১৬টি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা। বিতর্ক প্রতিযোগিতাটির ১ম পর্যায়ে প্রথম, কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল পর্ব গত ০৩-০৪ মে ২০১৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং ক্লাবের সহযোগিতায় টিএসসি অডিটোরিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্ব সেমিফাইনাল বিজয়ী দুই দল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর অংশগ্রহণে বিটিভি অডিটোরিয়াম-এ ০১ জুন ২০১৭-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে যা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ০৫ জুন ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিতার্কিক দল।

চিত্র ৩২ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত ৬ষ্ঠ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক ২০১৭-এর শুভ উদ্বোধন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনা সৃষ্টির জন্য দেশের সকল জেলার ২টি করে মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ঢাকা মহানগরের মাধ্যমিক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ১০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, হলিক্রস বালিকা স্কুল ও কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ইত্যাদির মতো ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় সবকটি স্কুলসহ কয়েকটি মাদ্রাসা ও প্রতিবন্ধি স্কুল অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

- দিবসটি উদযাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর নির্বাচিত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং জেলা পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করে।
- ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরের নির্বাচিত ১০২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন ডকুমেন্টারি সরবরাহ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, দেওয়াল পত্রিকা ও পরিবেশ বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
- দিবসটি উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং গ্রিন সেভার্স ও সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশ নামক দুটি বেসরকারি পরিবেশবাদী সংগঠনের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে পরিবেশ বিষয়ক গ্রিন ক্লাব গঠন করা হয়েছে। উক্ত ক্লাবের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে অক্সিজেন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভূমির অবক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মরুময়তা প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭ জুন ২০১৭ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের চামেলী সম্মেলন কক্ষে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ইসতিয়াক আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

টেলিভিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ প্রচার

পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম, সভা, সেমিনার, দিবস উদ্‌যাপন, মোবাইল কোর্ট/এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনাসহ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছে। জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এ সকল কার্যক্রমের সংবাদ এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় তথ্য প্রদান

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন অনুসরণে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ১২টি আবেদন/অনুরোধ পাওয়া যায়। আইন অনুসরণে প্রাপ্ত আবেদন/অনুরোধের সবগুলোরই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এবং গণসচেতনতামূলক ১১২টি বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্য প্রদান/তথ্য পেতে সহায়তা প্রদান

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আনুমানিক ৬৮০ জন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও সাংবাদিকগণকে পরিবেশ/পরিবেশ অধিদপ্তর বিষয়ক তথ্য প্রদান/তথ্য পেতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকাশনা:

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকা।
- জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ পুস্তিকা।
- পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচিতি (Introducing Department of Environment) ।
- ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান, ২০১৬-২০২১।
- শব্দ সচেতনতামূলক প্রচারপত্র ও স্টীকার।
- Rio Convention বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক বুকলেট।
- JCM বুকলেট (বাংলা ভার্সন)

অভিযোগ প্রতিকার ও গণশুনানি

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১ জুন ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০. ৫১২.৫১. ০০১.১৪-১৫৬ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার জেলা কার্যালয়, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিভাগীয় কার্যালয় ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার সদর দপ্তরে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ শুনানি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনসাধারণ এবং সুধিসমাজের পরামর্শ গ্রহণের জন্য গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গণশুনানীর পাশাপাশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত যে কোন বিষয়ে সরাসরি লিখিত অভিযোগ প্রদান করলেও পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত গণশুনানীতে প্রাপ্ত ও লিখিতভাবে দাখিলকৃত আবেদনসহ সর্বমোট ৮১৮টি অভিযোগ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৭৫৬টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে।

তথ্য আধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য বর্তমান সরকার ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত ২০০৯ সনের ২০ নং আইন) পাশ করে দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে। জনগণ ও সরকারের মেলন্ধন সৃষ্টি হলে সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি থাকে না। ফলশ্রুতিতে, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি প্রবণতা হ্রাস পায়। তথ্য অধিকার আইন প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক তাদের স্বীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে পরিবেশ অধিপ্তর এর কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তথ্য চেয়ে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ছিল ৪৯টি। প্রাপ্ত আবেদনের সবগুলোকে তথ্য সরবরাহ করে নিস্পত্তি করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বাংলাদেশে বর্তমানে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি অন্যতম পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ক্রমেই জটিল রূপ ধারণ করছে। বাংলাদেশে প্রতিদিন ২০,০০০ মেট্রিক টন আবর্জনা সৃষ্টি হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট বর্জ্যের ৫০% সংগ্রহ করতে পারে। বাকি বর্জ্য নিচু জায়গা, ড্রেন এবং রাস্তাঘাটে যত্রতত্র পড়ে থাকছে, ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টিসহ বর্জ্য পচে বায়ু দূষণ ও পানি দূষণ করছে এবং রোধ-ব্যাধির জীবাণুর বিস্তার ঘটাচ্ছে। অধিকন্তু স্থানীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত বর্জ্যও আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা হয় না। প্রচলিত পদ্ধতিতে সাধারণত কঠিন বর্জ্যকে বোঝা হিসাবে বিবেচনা করে উন্মুক্ত ডাপিং স্টেশনে ফেলে রাখা হয়। ফলে ডাম্পিং স্টেশনসমূহ একদিকে যেমন দ্রুত পূর্ণ হয়ে ধারণ ক্ষমতা হারাচ্ছে অন্যদিকে উন্মুক্ত বর্জ্য পচে প্রচুর গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গত হচ্ছে এবং সেই সাথে প্রচন্ড দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে পরিবেশ দূষণ করছে। এ প্রেক্ষিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে National 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Strategy for Waste Management প্রণয়ন করা হয়েছে। National 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Strategy বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়ন

পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশের শহরগুলোর জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ১৩৯১.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১০-জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো - গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস; পরিচ্ছন্ন ও বসবাসযোগ্য শহর গড়ে তোলা; Certified Emission Reduction (CER)/ Verified Emission Reduction (VER) বিক্রির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা; এবং জৈব সার ব্যবহার করে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। প্রকল্পের অধীন ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ২২-২৫ টন এবং ময়মনসিংহ পৌরসভায় ৮-১০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্ল্যান্ট দু'টি বর্তমানে উক্ত শহরগুলোর জৈব বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোস্ট সার উৎপাদন করে যাচ্ছে। অপরদিকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভায় যথাক্রমে ১৬-২০ টন ও ১২-১৪ টন উৎপাদন ক্ষমতার ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

চিত্র ৩৩ : কক্সবাজার পৌরসভা এলাকায় নির্মাণাধীন কম্পোস্ট প্ল্যান্ট

চিত্র ৩৪ : রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মাণাধীন কম্পোস্ট প্ল্যান্ট

প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণের লক্ষ্যে বাসাবাড়িতে বিতরণের জন্য মোট ১০,১৭৪ টি সবুজ (জৈব বর্জ্যের জন্য) ও হলুদ (অজৈব বর্জ্যের জন্য) বিন সরবরাহ করা হয়েছে এবং সংগৃহিত বর্জ্য পরিবহনের জন্য একটি করে বিশেষ ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী এবং সম্মানীত সচিব ট্রাক ও বিল বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ট্রাকগুলোতে জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদাভাবে ও আবদ্ধ অবস্থায় পরিবহণের সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় বর্জ্য পৃথিকীকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও কম্পোস্ট প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও মনিটরিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৫ সালে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রকল্প হিসেবে ইউএনএফসিসিসি কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।

চিত্র ৩৫ : প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা বিন ও ট্রাক হস্তান্তর অনুষ্ঠান

বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রকল্পের ১ম পর্বের ধারাবাহিকতায় ২য় পর্ব গ্রহণ করেছে। ২য় পর্বের আওতায় ফেনী ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পটিও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০০ লক্ষ্য টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ খ্রিঃ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R (Reduce, Reuse and Recycle) প্রকল্প বাস্তবায়ন

National 3R(Reduce, Reuse and Recycle) Strategy বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২১৮৩.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১০- মার্চ ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীন ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গুলশান, বারিধারা, ধানমন্ডি, মিন্টু রোড ও গণভবন, আজিমপুর সরকারী কলোনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ইস্কাটন, বেইলি রোড, সিদ্ধেশ্বরী, মতিঝিল, এলেনবাড়ী এবং চট্টগ্রাম শহরের খুলশী ও নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, আগ্রাবাদ, হালিশহর, মোহাম্মদ আলী রোডসহ অন্যান্য এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। থ্রি-আর পাইলট প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ (১) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর নির্বাচিত এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) সংক্রান্ত শ্রেয় ধারণা ও অনুশীলনের প্রসার; (২) কম্পোস্টিং-এর মাধ্যমে বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃব্যবহার; (৩) প্রকল্প এলাকায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস; (৪) বর্জ্যের উৎসে পৃথকীকরণ (Source segregation) এবং পুণঃচক্রায়ণের সুফল সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি; (৫)ভূমিভরাট (Landfill) এলাকায় বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস; (৬) সরকারী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ গ্রহণ; (৭) ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা, ধানমন্ডি, মিন্টু রোড ও গণভবন, আজিমপুর সরকারী কলোনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ইস্কাটন, বেইলি রোড, সিদ্ধেশ্বরী, মতিঝিল, এলেনবাড়ী এবং চট্টগ্রাম শহরের খুলশী ও নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, আগ্রাবাদ, হালিশহর, মোহাম্মদ আলী রোডসহ এ দুই মহানগরীর অন্যান্য এলাকায় থ্রি-আর (বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ণ) উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ এবং পাইলট, প্রদর্শনী ও রোড-শো'র মাধ্যমে এ উদ্যোগ দেশব্যাপী বিস্তৃতকরণ; (৮) শহরে বসবাসকারী অবহেলিত গরীবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;(৯) প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃচক্রায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি; (১০) কম্পোষ্টিং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন;(১১)আগ্রহী উৎপাদনকারী, ভোক্তা এবং পুনঃচক্রায়ণকারী কারখানাসমূহকে থ্রি-আর নীতিমালা, কর্ম-কৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা; (১২) ভূমিভরাট (Landfill) থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস; (১৩)"শূন্য বর্জ্য অর্থনীতি"-তে উত্তরণের পথসন্ধান। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো: (১) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কম্পোস্ট প্লান্টের জন্য জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; (২) দু'টি সিটি কর্পোরেশন-এর জন্য সংস্থানকৃত ২টি করে ৪টি ট্রান্সফার স্টেশনের জায়গা বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; (৩) থ্রি-আর প্রকল্পের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ওয়েস্ট কনসার্ন-কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে Letter of Invitation প্রেরণ করা হয়েছে; (৪) সংশোধিত প্রকল্পে ৬২৪টি রিক্সা-ভ্যান ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ ডক ইয়ার্ড ও খুলনা ডক ইয়ার্ড হতে রিক্সা-ভ্যানের নকশা সংগ্রহ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই পরার্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে কার্যক্রম

পলিথিন একটি অপচনশীল পদার্থ। তাই ইহা যত্রতত্র নির্গত হলে দীর্ঘ দিন প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। ফলে জীব বৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইহা মাটিতে সূর্যালোক, পানি এবং অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে মাটির উর্বরা শক্তি কমিয়ে দেয় এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে। ইহা শহরের নর্দমাসমূহ বন্ধ করে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্থ করে। পলিথিন দ্বারা ভরাটকৃত জমির উপর ভবন নির্মিত হলে তা ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে সর্বোপরি পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষিত খাবার খেলে চর্মরোগ ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পলিথিনকে ৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর কম তাপমাত্রায় পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস (ডাইঅক্সিন) সৃষ্টি হয়।

সহজলভ্য এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের কারণে সমগ্র বিশ্বে পলিথিন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে ইহা বর্তমানে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পলিথিনের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় সরকার দেশে নির্দিষ্ট পুরুত্বের পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। তবে কিছু কিছু পন্যের

বাজারজাতের জন্য সাধারণত রপ্তানিকৃত সকল পন্যের মোড়কের ক্ষেত্রে, রেনু পোনা পরিবহনের জন্য, পণ্যের গুণগতমান রক্ষার স্বার্থে প্যাকেজিং কাজে ব্যবহারের জন্য, মাশরুম চাষ ও প্যাকেজিং এর জন্য এবং নার্সারীর চারা উৎপাদন ও বিপণনের জন্য কিছু কিছু ছাড় দেওয়া রয়েছে। পরিবেশ বিনষ্টকারী পলিথিনের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। তবে কিছু কিছু পন্যেও মোড়কের জন্য পলিথিন উৎপাদনের অনুমোদন থাকায় উক্ত কারখানাগুলো গোপনে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগও তৈরী করে থাকে। তাছাড়া পলিথিনের সহজলভ্য বিকল্প তৈরী না হওয়ায় এর উৎপাদন ও বিপণন পুরোপুরি বন্ধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তর নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন ও বিপণনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বন্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন করে পরিচালককে আহবায়ক করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ, সিভিল সোসাইটি , সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার প্রতিনিধির সমন্বয়ে সারা দেশে মোট ৮(আট) টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্সসমূহ নিয়মিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার বন্ধে অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে টাস্কফোর্সসমূহের মাধ্যমে সারা দেশে ২০৬ টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে ২৭.৬৮ টন পলিথিন জব্দ করা হয়েছে এবং ২২.৪২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

- টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সহায়তায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদনকারী কারখানাসমূহ উচ্ছেদ বা কারখানার মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে ১১২৪টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৩৩.১৭ টন পলিথিন জব্দ ও ৯৯.৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

চিত্র ৩৬ : পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

চিত্র ৩৭ : বাজার কমিটির নেতৃবৃন্দ, দোকান মালিক এবং বাজারে আগত ক্রেতাগণের উপস্থিতিতে নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত নিষিদ্ধ শপিং ব্যাগ বিষয়ক সচেতনতামূলক পথসভা।

- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার কমিটির সদস্য, দোকান মালিক এবং পলিথিন প্রস্তুতকারকদের উপস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৪ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। ভোক্তা পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন বাজারে বাজার কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে পথসভা আয়োজনসহ বাজারে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে পলিথিন বিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

- পলিথিনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী প্রজন্মকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর ১০২টি এবং এর

বাইরে সারা দেশের ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ এবং পরিবেশের অন্যান্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় স্কুলসমূহে পলিথিন বন্ধসহ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা লিখন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া স্কুলসমূহে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ বিষয়ক লিফলেট ও বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি প্রদান করা হয়।এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পলিথিনসহ পরিবেশের অন্যান্য বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টির জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে আধাসরকারি পত্র প্রদান করা হয়েছে।

- বৈধ পলিথিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সনাক্ত করে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারী, ২০১৭ পর্যন্ত সারা দেশে ৮৭৭ টি বৈধ পলিথিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করা হয়েছে।

টেবিল ২১ : পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭		সর্বমোট
অভিযানের ধরন	মোবাইল কোর্ট	টাস্কফোর্স	মোবাইল কোর্ট	টাস্কফোর্স	মোবাইল কোর্ট + টাস্কফোর্স
অভিযান সংখ্যা	৫৫৬	১০২	৫৫৬	৭৬	**১২৯০**
অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৬৪০	৬৪২	১১২৪	২০৬	**৩৬১২**
জব্দকৃত পলিথিনের পরিমাণ (টন)	১৬৬.৯	৭১.৪	১৩৩.১৭	২৭.৬৮	**৩৯৯.১৫**
আদায়কৃত জরিমানা (টাকা)	১,৮৫,১৫,০০০/-	৭৭,৬২,৩০০/-	৯৯,৫০,৯০০/-	২২,৪২,৫০০/-	**৩,৮৪,৭০,৭০০/-**

পাহাড় ধ্বসজনিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তর

পাহাড় পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের সুউচ্চ পাহাড় গুলো মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট ও উত্তর বঙ্গসহ দেশের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। এ সকল পাহাড় এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য যেমন প্রয়োজনিয় তেমনি প্রয়োজন এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্যেও। কিন্তু অবৈধ পাহাড় কর্তন, পাহাড়ি বনভূমি উজাড়, পাহাড়ের পাদদেশে অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণসহ নানা ধরণের অবৈধ কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে দেশের পাহাড়সমূহ আজ ধ্বংসের সম্মুখীন।

বাংলাদেশের পাহাড়গুলো মূলত বেলে পাথর, পলিপাথর ও কর্দমশিলা দ্বারা গঠিত। ফলে মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে এক দিকে যেমন পাহাড়ের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অতিমাত্রার বৃষ্টিপাত ধ্বংসপ্রাপ্ত এসকল পাহাড়সমূহকে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ সকল কারণে প্রতিনিয়ত পাহাড় ধ্বস এবং পরিবেশসহ জানমালের ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। বিগত ১৩ জুন, ২০১৭ তারিখের রেকর্ড পরিমাণ বর্ষণসহ তার পূর্ববর্তী কয়েকদিনের টানা বর্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ জেলায় (রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে) ব্যাপক পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে। সম্পদহানীসহ ১৫৩ জনের প্রাণহানী ঘটে এবং বহু মানুষ আহত হয়। এছাড়াও বিগত ১৮/০৬/২০১৭ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলাস্থ সদর ইউনিয়নের বাতাউরা-ডিমাই পাহাড়ী এলাকায় ধসের কারণে আরো ২ জনের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটেছে।

পাহাড় কাটা রোধকল্পে সরকার ২০১০ সালে পাহাড় কাটা বিষয়টিকে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ অন্তর্ভুক্ত করে আইনটি সংশোধন করে এবং তা মোবাইল কোর্ট আইনে অন্তর্ভূক্ত করে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬খ ধারা অনুযায়ী "কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন বা মোচন (cutting and/or razing) করা যাইবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।"

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ দেশের অন্যান্য পার্বত্য এলাকায় অবৈধভাবে পাহাড়/টিলা কর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট করার অভিযোগ প্রায়শই পাওয়া যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পাহাড় কাটা জনিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ৭ ধারা মোতাবেক এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়সহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা

চিত্র ৩৮ : পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পাহাড় ধস এলাকা পরিদর্শন

প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাহাড় কাটার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় সর্বমোট ২৬০ টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫২০ টি অভিযান পরিচালনা করে পাহাড় কাটার অভিযোগে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা বাবদ মোট ৪.৮১ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাপক পাহাড় ধস এবং প্রাণহানির ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পাহাড় কর্তনই পাহাড় ধসের মূল কারণ নয়, অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে এটি একটি বিষয় মাত্র। যেমন সাম্প্রতিক পাহাড় ধসে রাঙ্গামাটি এবং হোয়্যাইকং এ যে পাহাড় ধস হয়েছে সেখানে পাহাড় কর্তনের কোন আলামত ছিল না। পাহাড়গুলি ন্যাড়া (গাছপালাবিহীন) পাহাড় ছিল এবং এই অঞ্চলে যেখানে বছরে গড় বৃষ্টিপাত ২০০০-২২০০ মিলিমিটার সেখানে পাহাড় ধসের দিন অর্থাৎ একদিনেই ৪০০ মিলিমিটার এর অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এরুপ ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্টি বিপুল পানি বেলে পাথর, পলিপাথর ও কর্দমশিলা দ্বারা গঠিত আমাদের পাহাড়গুলোর পক্ষে ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তাই পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

ওজোন স্তর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ফেজ আউটের লক্ষ্যে-পরিবেশ অধিদপ্তর **“রিনিউয়াল অব ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৭)” শীর্ষক** প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ১৩১.৬২ লক্ষ টাকা (জিওবি: ইন কাইন্ড টাকা ২৯.৭০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য টাকা ১০১.৯২ লক্ষ) ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ - মার্চ ২০১৭ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নকারী সংস্থা এম এল এফ/ইউএনডিপি। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেলের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য এবং কান্ট্রি প্রোগ্রাম-এ বর্ণিত ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনা করা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়ন কার্যক্রম অক্ষুণ্ন রয়েছে।

প্রকল্পটির আওতায় মূল কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ২০১৪ ও ২০১৫ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে ডাটা প্রেরণ।
- ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালন করা।
- লাইসেন্স প্রথার আওতায় ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
- ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার মনিটরিং করা।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসে ওজোনস্তর ক্ষয় ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম চালানো।
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।
- মন্ট্রিল প্রটোকল ও ওজোনস্তর ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সম্মেলন ও কর্মশালায় যোগদান করা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত 38th Open Ended Working Group Meeting, 3rd Extraordinary Meeting of the Parties এবং 58th Implementation Committee Meeting-এ যোগদান।
- রুয়ান্ডার কিগালীতে মন্ট্রিল প্রটোকলের ২৮তম পার্টি সভায় এবং ৫৭তম ইমপ্লিমেনটেশন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বাংলাদেশ বেতারে সাক্ষাৎকার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান।
- আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে ব্যাপক প্রচার ও জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার এবং ফোল্ডার মুদ্রণ এবং শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
- ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি লাইসেন্স প্রদান এবং ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণ।
- HCFC Phase-out Management Plan-UNEP Component (Stage-II) প্রণয়নের লক্ষ্যে Stakeholder Meeting আয়োজন করা হয়।
- ২০১৫ সালের ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহের ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ওজোন সচিবালয় ও মাল্টিলেটারাল ফান্ডে প্রেরণ।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Capacity Building of DoE Officials on the Protection of Ozone Layer - শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় মন্ট্রিল প্রটোকল-এর বিধিবিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হযেছে এবং বাংলাদেশ প্রটোকলের বিধি-বিধানসমূহ পালনের ক্ষেত্রে Compliance-এ রয়েছে।

চিত্র ৩৯ : আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৬ উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন **"ইমপ্লিমেনটেশন অব এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেট প্ল্যান ইউএনইপি- কম্পোনেন্ট (স্টেজ-১)"** শীর্ষক সংশোধিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ২৯৩.৯০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য ২৭৭.৭০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি (ইন কাইন্ড) ১৬.২০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ -জুন ২০১৮ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নকারী সংস্থা এম এল এফ/ইউনেপ। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সার্ভিসিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের জন্য Code of Practice প্রণয়ন ও বিতরণ; ওডিএস এর আমদানী- রফতানী নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান রোধের জন্য কাস্টমস ও সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় Identifier সরবরাহ; এবং ওজোন স্তর ক্ষয়রোধের লক্ষ্যে আমদানিকারক, ব্যবহারকারী ও জনগণের মধ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা ইত্যাদি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ভিত্তি বছরের ব্যবহারের তুলনায় ২৪.৫৩ ওডিপি টন(৩৩.৭৭%) কমিয়ে আনা হবে।

প্রকল্পটির আওতায় মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ :

ক) রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানদের জন্য কোড অব প্রাকটিস প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ।

খ) রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ) ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে কাস্টমস অফিসার ও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ) চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে Customs Entry Point গুলোতে ODS Identifier প্রদান।

ঙ) বেসলাইন সার্ভের মাধ্যমে Communication Materials নির্ধারণ, মুদ্রণ ও বিতরণ।

চ) দৈনিক পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ, ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদি তৈরী করা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- স্থানীয় প্রশিক্ষক দ্বারা রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের ১৯ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় (কিশোরগঞ্জ-০২, মৌলভীবাজার-০২, ময়মনসিংহ-০২, কক্সবাজার-০১, ফরিদপুর-০২, ঢাকা-০২ (মহাখালী, বনানী, গুলশান), বগুড়া-০২, ঢাকা-০২ (ধানমন্ডি, নিউমার্কেট ও লালবাগ), মানিকগঞ্জ-০২, নারায়ণগঞ্জ-০২ অঞ্চলে মোট ১১০১ জন টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও টেকনিশিয়ানদের জন্য প্রস্তুতকৃত সহায়ক পুস্তক বিতরণ করা হয়।
- আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ কাস্টমস, কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের মোট ৩২ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে Training Workshop on Green Trade for Protection of Ozone Layer শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- পরিবেশ অধিদপ্তর ওজোন স্তর রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর "Protection of Ozone Layer; Global and National Response" শীর্ষক শিরোনামে ১০০০ কপি এবং "ওজোন স্তর রক্ষা বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্যোগ" শীর্ষক শিরোনামে ৩০০০ কপি পুস্তক মুদ্রণ করা হয়।
- ওডিএস চোরাচালান রোধে নেপালে অনুষ্ঠিত বর্ডার ডায়ালগে অংশগ্রহণ।
- ভারতে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশের কাস্টমস অফিসারের অংশগ্রহণ।
- বেনাপোল কাস্টমস হাউজে "Training Workshop on Green Trade for Protection of Ozone Layer" শীর্ষক কর্মশালার মাধ্যমে ৬৭ জন কাস্টমস কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্র ৪০ : রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সনদ বিতরণ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	মূল উদ্দেশ্য
ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-ভুক্ত প্রকল্প (১২টি)		
১.	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর)।	রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোর বায়ুদূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
২.	প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্রে উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।	• একমাত্র কোরাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের জীব-বৈচিত্রের উন্নয়ন; • জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বীপের জনগণের আর্থ- সামাজিক অবস্থার এবং ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থার উন্নয়ন; • সেন্টমার্টিন দ্বীপের কোরাল এবং ফ্লোরা ও ফনা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন; • সেন্টমার্টিন দ্বীপের জন্য বর্জ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা; • সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বিনিময়।
৩.	বাংলাদেশ ব্রিক কিলন্ এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট।	পরিবেশ রক্ষায় আধুনিক ইটভাটা স্থাপওনে মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে ইটভাটাগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা প্রদান করা।
৪.	জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় অবকাঠামো বাস্তবায়ন (আইএনবিএফ) প্রকল্প।	বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নপূর্বক বায়োসেফটি বিষয়ক সক্ষমতা অর্জন করা এবং সার্বিক উদ্দেশ্য হল: কার্টাগেনা প্রটোকল অন্ বায়োসেফটি-এর বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে কার্যকর এবং গতিশীল ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য জোরদার কার মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং মানবস্বাস্থ্য অটুট রাখা।
৫.	ইমপ্লিমেন্টেশন অব এইচ সি এফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্লান (এইচপিএমসি)-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট	মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সার্ভিসিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিসিয়ানদের জন্য Code of Practice প্রণয়ন ও বিতরণ; ওডিএস এর আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান রোধের জন্য কাস্টমস ও সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় Identifier সরবরাহ; এবং ওজোনস্তর ক্ষয়রোধের লক্ষ্যে আমদানীকারক, ব্যবহারকারী ও জনগণের মধ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৬.	বাংলাদেশ থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন	বাংলাদেশ সরকারের voluntary obligation হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - এ পেশ করাই এই প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভোগ ও সমস্যা হতে দেশকে সুরক্ষাকরণ ও দেশে জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করাও এই প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। তাছাড়া Green House Gas Inventory প্রস্তুত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তাকরণও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
৭.	ইনস্টিটিউশন্যাল স্ট্রেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওডিএস ফেজ-৭)।	বাংদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেলের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য এং কান্ট্রি প্রোগ্রাম-এ বর্ণিত ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনা করা।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	মূল উদ্দেশ্য
৮.	স্ট্রেনদেনিং মনিটরিং এ্যানাড এনফোর্সমেন্ট ইন দি মেঘনা রিভার ফর ঢাকাস সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই।	মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কৌশল শক্তিশালী করার মাধ্যমে মেঘনা নদী হতে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ দীর্ঘ মেয়াদে পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে সহযোগীতা প্রদান করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
৯.	ইনস্টলেশন অব ৭০,০০০ ইমপ্রুভড কুক স্টোভস (আইসিএস) ইন সিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ	টেকসই উন্নত চুলা স্থাপনের মাধ্যমে রান্নার কাজে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস করা। রান্নাঘরে অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ (Indoor Air Pollution) হ্রাস করা।
১০.	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প স্থায়ী জলবায়ু দূষক SLCPs হ্রাসকরণ শীর্ষক কারিগরী সহায়তা	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষক SLCPs হ্রাস করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
১১.	ক্লাইমেট রেজিলেন্ট ইকোসিস্টেমস এ্যান্ড লাইভলিহুড (ক্রেল) ইন ইসিএ।	প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন জলাভূমি এলাকার জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সহব্যবস্থাপনা মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে ভূমিকা রাখা।
১২.	ন্যাশনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশনরিও কনভেনশন থ্রু এনভায়রনমেন্টাল গভর্ন্যান্স।	বৈশ্বিক/গ্লোবাল পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। মানব সম্পদ উন্নয়নে বৈশ্বিক/গ্লোবাল পরিবেশ বিষয়ক কনভেনশনসমূহকে মূলধারায় নিয়ে আসা। রিও কনভেনশন ও টেকসই উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় করে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
(খ) রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি		
১.	শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদায়িত্বমূলক কর্মসূচি।	"শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টিও অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগ।
(গ) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		
১.	গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বর্জ হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১)।	ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর নির্বাচিত এলাকায় কঠিন বর্জ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করা।
২.	সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/ মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব।	কঠিন বর্জ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করা ও গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো।
৩.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা।
৪.	বন্ধু চুলা বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ - ২য় পর্ব।	জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলার উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাজার সৃষ্টি করা।
৫.	বাংলাদেশের উপকুলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা অভিযোজন প্রক্রিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনকে মেইনস্ট্রিম করা।	উপকুলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, অভিযোজন প্রক্রিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনকে মেইনস্ট্রিমিং করা।
৬.	Strengthening and Consolidation of Community Based Adaptaion in the Ecological Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection.	• প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ; • পরিবেশবান্ধব বিকল্প আয়মূলক কর্মসংস্থান কার্যক্রম জোরদারকরণ; • জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম প্রচলন এবং প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণ। • প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রমের • জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো জোরদারকরণ; • প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার